শিক্ষাপ্রকল্প

5516

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় —

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্বভারতী

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

। ১৩৫২ ।

৩৭. হিন্দু সংগীত : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯. কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : সুশোভন দত্ত
৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫. নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪৬. প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা : ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭. সংস্কৃত সাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮. অভিব্যক্তি : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

। ১৩৫৩ ।

৪৯. হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা : ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০. ন্যায়দর্শন : শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য
৫১. আমাদের অদৃশ্য শত্রু : ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২. গ্রীক দর্শন : শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩. আধুনিক চীন : থান য়ুন শান
৫৪. প্রাচীন বাংলার গৌরব : মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৫৫. নভোরশ্মি : ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার
৫৬. আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন : শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
৫৭. ভারতের বনৌষধি : ডক্টর শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায়
৫৮. উপনিষদ্ : মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
৫৯. শিশুর মন : শ্রীসুখেনলাল ব্রহ্মচারী

। ১৩৫৪ ।

৬১. ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬২. ভারতশিল্পে মূর্তি : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬৩. বাংলার নদনদী : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৬৪. ভারতের অধ্যাত্মবাদ : শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্ম
৬৫. টাকার বাজার : শ্রীঅতুল সুর
৬৬. হিন্দুসংস্কৃতির স্বরূপ : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী

। ১৩৫৫ ।

৬৭. শিক্ষাপ্রকল্প : শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

শিক্ষাপ্রকল্প

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

বৈশাখ ১৩৫৫

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

ভূমিকা

সাতাইশ বৎসর পূর্বে "শিক্ষার বীজ" নামক প্রস্তাব ও ত্রিশ বৎসর পূর্বে "দেশে জ্ঞানপ্রচার" নামক প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম। শিক্ষা সম্বন্ধে পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বে যে অভাব দেখিয়াছিলাম, এখন তাহা দেখিতেছি। সত্য বটে, এই এক পুরুষ কালের মধ্যে সহস্র সহস্র বালকবালিকা মাতৃকা পরীক্ষা পাস হইয়াছে, বি-এ, এম-এ উপাধিধারী বাড়িয়াছে। সংবাদপত্রের পাঠক বাড়িয়াছে, বাংলা বই বাড়িয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর আয়ুষ্কাল বাড়ে নাই, দারিদ্র্য হ্রাস হয় নাই, বাঙ্গালী চরিত্রের গুণ বাড়ে নাই, চরিত্রের দোষ বাড়িয়াছে। পূর্বে এত অসত্য, এত প্রবঞ্চনা ছিল না। যুদ্ধকাল হইতে অর্থ-লালসা এত বাড়িয়াছে যে, চুরি করিতে কিছুমাত্র আত্মগ্লানি ও লজ্জা দেখা যায় না। শিক্ষা দ্বারা এই দোষ নাশ করিতে পারা যায়। টাকার দাম পূর্ববৎ না হইলে অভাবের পীড়া হ্রাস হইবে না, অর্থ-লালসারও হ্রাস হইবে না।

জগজ্জননীর কৃপায় এখন আমরা শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষার পদ্ধতি যথেচ্ছ নির্ধারণ করিতে পারি। পশ্চিমবঙ্গরাজ এই বিষয় চিন্তা করিতেছেন। আদ্যশিক্ষা অবশ্যক হইবে, জ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা হইবে। এই সময়ে আমার প্রস্তাবদ্বয় শিক্ষানীতির অন্বেষণে সাহায্য হইতে পারে।

বাঁকুড়া
১৩৫৫। বৈশাখ

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

প্রথম খণ্ড

পাঠশালায় শিক্ষা

শিক্ষার বীজ

দেশের অভ্যুদয়ের কারণত্রয়।

দেশের অভ্যুদয়ের কারণ তিনটি,—(১) মানুষ অর্থাৎ লোকের সত্ত্ব, (২) দেশ, (৩) শিক্ষা।

(১) মানুষ।

সকল মানুষ সমান শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে দুইটি মানুষ সমান হয় না। ইহা যেমন সত্য, তেমনই সত্য—শিক্ষা দ্বারা নিঃসত্ত্বকে সত্ত্ববান্ করিতে পারা যায় না। যে স্বভাবতঃ দুর্বল, তাহাকে ব্যায়াম করাও, সুপথ্য ভোজন করাও, আর স্বাস্থ্যকর দেশে বাস করাও, কিছুতেই তাহাকে সবলের সমান করিতে পারা যায় না। এইরূপ, দুর্বলচিত্তকে শিক্ষা দ্বারা সবল করিতে পারা যায় না। খর-লোম তৈল-সিক্ত করিয়া অশ্ব-লোমের তুল্য চিক্কণ করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাতে খরতা বাহিরে প্রকাশিত না হইলেও ভিতর হইতে লুপ্ত হয় না; সুযোগ পাইলেই তাহা বাহিরে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যখন প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তখন আমরা আশ্চর্য হই; বলি, বকধার্মিক, ভণ্ডতপস্বী, ধর্মধ্বজী, ইত্যাদি। এইরূপ দৈত্যকুলে প্রহ্লাদও জন্মগ্রহণ করেন; আমরা তখনও আশ্চর্য হই। জাপানের অভ্যুদয়ের মূলে কেবল বিলাতী শিক্ষা নহে। সে জাতির মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা শিক্ষিত হইয়া জাতিটাকে নূতন মার্গে চালিত করিয়াছে। ইহাকেই সত্ত্ব (inherent character) বলিতেছি। ইহার উৎপত্তি কি, কিসে বা ইহার পরিবর্তন হয়, সে-সব গুরুতর প্রশ্নের বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন।

(২) দেশ।

দেশের গুণে মানুষের দেহের ও মনের ও আত্মার, এক কথায় মনুষ্যত্বের ইতর-বিশেষ হয়, এক-একটা জাতির চরিত্র চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। জাপানীকে যদি তিব্বতে বাস করিতে হইত, আমেরিকার রাজ্য-যুতি যদি সাইবেরিয়ায় বসানা যাইত, তাহাদের বর্তমান গৌরব হইত কি? দেশের কোন্ গুণে অধিবাসীর কোন্ গুণ, কিংবা কোন্ কর্ম তাহার সহজ হয়, তাহার বিচারও গুরুতর, এবং এখানে নিষ্প্রয়োজন। 'দেশ' (environment), একটা ব্যাপক সংজ্ঞা; মানুষের সত্ত্ব যেমন অ-দৃষ্ট, দেশেরও অধিকাংশ বিষয় অ-দৃষ্ট। শিক্ষার (culture, training) ফল কিন্তু দৃষ্ট; এই কারণে আমরা শিক্ষার আশ্রয় লইতে এত ব্যগ্র।

(৩) কালোপযোগী শিক্ষা।

এই শিক্ষা কিন্তু দেশ কাল ও পাত্র,—এই তিন উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া তদুপযোগী করিতে হইবে। কি উদ্দেশ্য-সিদ্ধির, কি কার্য-সিদ্ধির নিমিত্ত শিক্ষা চাও, তাহা শিক্ষা-পদ্ধতির গোড়ায় বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। পাত্র ও দেশ ভগবদ্-দত্ত; পরিবর্তনের উপায় নাই। কাল কিন্তু নিত্যপরিবর্তনশীল। ইংরেজ যদি এদেশে না আসিত, যদি বণিক্-জাতি না হইত, যদি ঐহিক সুখ-ভোগ একান্ত জ্ঞান না করিত, তাহা হইলে আমাদেরও কাল ভিন্নরূপ হইত। জাপানে বিদেশী, পশ্চিমদিগ্বাসী না আসিলে তাহার কাল যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিত। বিদেশের একএকটা প্রবল ধাক্কা আসে, দেশের কালের কপাট হঠাৎ খুলিয়া যায়। কখনও কখনও অজ্ঞাত কারণে দেশের চিত্ত নড়িয়া উঠে। কালের স্রোত একটানা বহিতেছিল, বুদ্ধদেব ও চৈতন্যমহাপ্রভুর স্কন্ধে দেবতা ভর করিলেন, কালের স্রোত উজান বহিতে লাগিল। গৌড়নগর ধনধান্যে পরিপূর্ণ ছিল, লোকে বলে কি এক রোগের ভূত আসিয়া তাহাকে শ্মশানভূমি করিয়া দিয়াছিল। অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি দেবতার মার; মেলেরিয়া ও কলেরা, বোধ হয়, ভূতের মার। পড়িয়া পড়িয়া কত মার খাইতেছি: আর বুক ফুলাইয়া কোঁচা দোলাইয়া বলিতেছি, 'লাগে নাই', 'বেশ আছি।' প্রকৃতির শেষ প্রবোধন (warning) যে বেদনা, তাহাও হারাইতে বসিয়াছি।

প্রাণ ও ধনের নিমিত্ত শিক্ষা।

এমন দুরন্ত কালে শিক্ষাকেও দুরন্ত হইতে হইবে। আজি (১৯২০ খিষ্টাব্দ) না হয়, ইয়ুরোপের প্রলয়কাণ্ডে আমাদের অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট ঘটিয়াছে। কিন্তু দুই পুরুষ কাল,—দুই পুরুষকাল!—মেলেরিয়া রাক্ষসী থানা পাতিয়া বসিয়াছে; সরিয়া যাইবার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কত লোককে যে খাইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। যাহারা গ্রাস হইতে খসিয়া পড়িয়াছে, তাহারা বাঁচিয়া আছে, কি মরিয়াছে, সহজে বুঝিতে পারা যায় না। এত বড় ঘটনা, যাহাতে দেশকে-দেশ হীনবীর্য হইয়া পড়িয়াছে, সে দেশ আর দাঁড়াইতে পারিবে কি? দেশের নূতন আইনে যে বাঙ্গালী অমাত্য নিযুক্ত হইবেন, দেখিতেছি তাহাঁকে অসাধ্য সাধন করিতে হইবে। মহামারী হইতে দেশকে মুক্ত করিতে হইবে, অন্ন-বস্ত্র দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে, আর শিক্ষা দিয়া এই দুইএর প্রতিষেধ কল্পনা করিতে হইবে।

শিক্ষা এক সংস্কার।

শিক্ষা একটা উপায়, একটা বড় সং-স্কা-র; এদেশেই এই সংস্কার-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে দ্বি-জ বলা হইত। ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম হইলেই দ্বি-জ হইত না; যাহার উপনয়ন না হইত, সে দ্বিজ হইত না। আর সেকালে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের পুত্রের উপনয়ন না হইলে সে শূদ্র বলিয়া গণ্য হইত। ইদানী আমরা মনে করিতেছি, শিক্ষা দেশময় অবশ্যক (compulsory) করিতে বলিয়া একটা নূতন কিছু করিতে বলিতেছি। মোটেই না। যে শিক্ষা অবশ্যক ছিল, তাহাকে কালোপ-যোগী করিয়া পুনঃ প্রবর্তিত করিতে বলিতেছি, নর-নারী-নির্বিশেষে দেশোপযোগী করিতে বলিতেছি।

এখনও ব্রাহ্মণকুমারের উপনয়ন হইতেছে; তাহার স্কন্ধে উপবীত লম্বিত হইতেছে, কর্ণে সাবিত্রী উচ্চারিত হইতেছে, কিন্তু যে উপনয়নের কথা বলিতেছি, ইহা সে উপনয়ন নহে। সে উপনয়ন তিন দিনে সমাপ্ত হইত না, চতুর্থ দিনে গুরুগৃহ হইতে সমাবর্তনও হইত না।

একালে সে উপনয়ন আর চলিবে না। কিন্তু তাহার ভাব যথাসাধ্য রক্ষা করিয়া শিক্ষা-ক্ষেত্রে প্রবাহিত করিতে বলি। বঙ্গে ব্রাহ্মণ মাত্র সাড়ে বার লক্ষ; দুই কোটি হিন্দুর বাকি সব শূদ্র।

যদি বা অন্য বর্ণ আছেন, তাহা নগণ্য। বঙ্গের অধিকাংশ মুসলমানের পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন, বোধ হয় অধিকাংশ শূদ্র ছিলেন। বহুকাল দ্বি-জের সেবা করিয়া হউক, বঙ্গভূমি বৌদ্ধধর্মের ও শক্তি-তন্ত্রের লীলা-নিকেতন বলিয়া হউক, সেদেশে মহাপ্রভু চৈতন্যের আবির্ভাব-বশেই হউক, বঙ্গের শূদ্র প্রাচীনকালের শূদ্র আর নাই। বঙ্গে কেন, বহু প্রদেশে নাই। এই শূদ্র শিব-শক্তির বা রাধাকৃষ্ণের তত্ত্ব অক্লেশে বুঝিতে পারে। ইহা জ্ঞান-বিস্তারে অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে। পাত্র আছে; আস্তিক্যের বীজ গ্রহণের শক্তি আছে। ইহাদিগকে একালের দ্বিজ করিয়া লওয়া কঠিন নহে। কারণ শিক্ষা দ্বারা মানুষের কতকগুলা দোষ শোধ্‌রাইতে পারা যায়; বিশেষতঃ যে-সব গুণের বীজ থাকে, সে-সব বীজকে অঙ্কুরিত, বর্ধিত ও ফল-প্রসু করিতে পারা যায়। এই কারণেই উপনয়ন একটা প্রধান সংস্কার গণ্য হইত।

কন্যা-শিক্ষা।

বিবাহ আরও বড় সংস্কার। শুধু সেকালের হিন্দু স্মার্তা-চার্যের নিকট বড় ছিল না; একালের সমাজতত্ত্বদর্শীর নিকটও বড়। কিন্তু লোকে জানে না, বিবাহ একটা সংস্কার। না জানিলেও সংস্কার সংস্কারই থাকে। কিন্তু জানিলে নিজের ও সমাজের হিত-সাধন হইত। বিবাহ একপুরুষের সংস্কার নহে; যে বিবাহ করে কেবল তাহাকেই দোষ গুণ ভুগিতে হয় এমন নহে, পরিবারবর্গও ছাড়িয়া দিই; পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে অন্ততঃ তিনচারি পুরুষ সে বিবাহের ফল ভোগ করে। লোকে বোঝে না, বিবাহ পুত্রার্থে, কামার্থে নহে। এই জ্ঞান জন্মিলে দেশে কন্যা-শিক্ষা প্রসারিত হইবে; পুত্রের তুল্য যত্নে কন্যা পালিত ও শিক্ষিত হইতে থাকিবে। তখন বর-পণ গিয়া হয়ত কন্যাপণ আসিবে। কারণ যাহাকে সহধর্মিণী করা যাইবে, যাহাকে পুত্রার্থে লাভ করিতে হইবে, তাহাকে ঘটকের দোকানে হঠাৎ পাওয়া যাইবে না; তাহাকে নিশ্চয়ই সমাদরে গ্রহণ করিতে ও সমাদরে রক্ষা করিতে হইবে। ইস্কুল-কলেজের শিক্ষিতেরা সামাজিক অনুষ্ঠান-বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ। তাহারা এসব বিষয়ের উপদেশ পায় না; বর্তমান সমাজ-ব্যতিরিক্ত শিক্ষার দোষই এই।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজন।

আমাদের দেশের পক্ষে এই শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। সমাজের বাহিরে থাকাতে তাহার দোষ গুণ সহজে চোখে পড়িতেছে। অপর সমাজের তুলনায় নিজের সমাজের কোন্ অংগে বিকার জন্মিয়াছে, তাহা সহজে ধরিতে পারা যায়, প্রতিকার তত সোজা না হইলেও লক্ষ্য থাকে। কালে কতক লোক বিদ্রোহী হইয়া উঠে, তাহারা নিজেদের জীবনে ফলাফল ভোগ করিয়া গণের পথপ্রদর্শক হয়। এইরূপে বিদ্রোহী মাত্রেই চোখে আংগুল দিয়া দেশের ক্ষত দেখাইতে থাকে, এবং কালে তাহার আরোগ্যেরও সূচনা করে। এই যে 'অস্পৃশ্য জাতি', 'অনুন্নত জাতি' নামে হিন্দু সমাজে একটা বিষম ব্যাধি বহুকাল হইতে নালী-ক্ষতে পরিণত হইয়া আছে, সমাজের ভিতর হইতে তাহার শোধন হইত কি না, সন্দেহ। যে কারণে সে জাতি অস্পৃশ্য ছিল, যে কারণে অন্য এক জাতির স্পৃষ্ট জল অমেধ্য বিবেচিত হইত, এখন সে কারণ আর নাই! আমরা বুঝিয়াছি দেহের ও চিত্তের শুচিতা-রক্ষার নিমিত্ত যত্নবান্ হইতে হইবে; এবং কদাচার ও অসৎ কর্ম দ্বারা সে শুচিতা রক্ষা পাইতে পারে না। হোটেলে ভোজনের আশংকাও ত এই। অপরদিকে উনানের চারিদিকে জলের রেখা টানিয়া যে আত্মতুষ্টি, তাহা হিন্দুস্মৃতিশাস্ত্রের ভাবার্থ বিস্মরণের ফল। ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম হইলে ভ্রষ্টাচার ও অসৎমার্গাবলম্বের দোষ যায় না। এরূপ ব্রাহ্মণের প্রদত্ত জলও অপেয়। কুলধর্ম অগ্রাহ্য নহে; কিন্তু সদাচার ও সদ্ব্যবহার দ্বারা নিষ্কুলীনকে কুলীন করা এদেশে অজ্ঞাত নহে। মধ্যশিক্ষা ও অন্ত্যশিক্ষা -সময়ে ছাত্রদিগকে গুরুকুলে বাস করিতে হইবে। তখন তাহাদিগের যে শৌচ অভ্যাস হইয়া যাইবে, তাহার ফল সহজে নষ্ট হইবে না।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় স্মৃতির হ্রাস।

একালের পাশ্চাত্য শিক্ষা নূতন মার্গে ধাবিত হইয়াছে, বুদ্ধির বিকাশকেই এক কাম্য করিয়া ধরিয়াছে। ফলে স্মৃতিশক্তি, যে শক্তি নইলে সংসারে একদিন টিকিতে পারা যায় না, সে শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। এখন রব উঠিয়াছে, মুখস্থ করিও না, বুঝিয়া রাখ। কিন্তু রাখার নামই ত স্মৃতি। বুদ্ধির বিকাশ চাই; কিন্তু তা বলিয়া স্মৃতির ধ্বংস চাই না। টোলে-পড়া পণ্ডিত মহাশয়দিগের স্মৃতি

দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। তাহাঁরা না পড়িয়া পণ্ডিত নহেন. না বুঝে পণ্ডিতও নহেন। আমরা আবৃত্তির নামে ডরাই, ছেলেরা আরও ডরায়। একই পদ বা বাক্য যাহা পড়িতে ভাল লাগিতেছে না, মনে রাখিতে পারা যাইতেছে না, তাহাকে কণ্ঠে ধারণ করিতে হইবে,—ইহা শুনিলেই সন্তাপ ও ক্রোধ জন্মে। আমি বলি, এই কারণেই স্মৃতির অভ্যাস, শারীরিক ব্যায়ামের তুল্য, হিতকর। কষ্টকর ত্যাগ করিতে করিতে কেবল সুখ, কেবল আহ্লাদ, কেবল ইচ্ছা, কর্মের প্রবর্তক হইয়া দাঁড়ায়। তখন শিক্ষার আর কি থাকে?

ইচ্ছা-শক্তির হ্রাস।

যাহা প্রথমে অসাধ্য মনে হয়, তাহাকে সাধ্য করিয়া তোলা, ষোল আনা না হউক অন্ততঃ বার আনায় সিদ্ধিলাভ করা, শিক্ষার প্রধান ফল। চেষ্টা কর, চেষ্টা কর— লোকে এই উপদেশ দেন। কিন্তু চেষ্টার গোড়ায় যে ইচ্ছাশক্তি, তাহার চালনা না হইলে উপদেশ পালনই অসাধ্য। আমরা ব্রত-গ্রহণের, ব্রত-আচরণের উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়াছি; মনে করিয়াছি, সে-সব কুসংস্কার। কিন্তু ইহার ফলের নিমিত্ত পরকালের দিকে তাকাইতে হইবে না, ইহার ফল ইহকালেই প্রত্যক্ষ হয়। আমরা ইংরেজী অনুবাদ করিয়া বলি, বিদ্যার পথ রাজপথ নহে; অথচ সে পথে রাজভোগের ব্যবস্থা হইতেছে। এত ভোগে (যদিও দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে দুঃখভোগ) থাকিয়া চিত্ত নির্মল ও দৃঢ় হইতে পারে না। আমরা জ্ঞানের শক্তি মানি, ক্রিয়ার শক্তি আরও মানি; মানি না ইচ্ছার শক্তি! যে বাঙ্গালীর ভীরুতা-অপবাদ ছিল, সেই বাঙ্গালীর সুকুমার পুত্রেরা কিসের বলে ইয়ুরোপের রণক্ষেত্রে বীরের পরিচয় দিয়াছে? তাহারা কখনও কোনও কষ্টকর ব্রত গ্রহণ করে নাই। গুরুকুলে দৃষ্টান্ত পাইলে আমাদের পুত্রেরা কি না করিতে পারে? ছোট ছোট, কিন্তু অনভ্যস্ত ও কষ্টকর কাজ করিতে করিতে যে চিত্তবল জন্মে, সংসারে সে বলের নিকট অপর বল পরাস্ত হয়। "আমি ব্রাহ্ম মুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করিব", "আমি বিনা পাদুকায় এক বৎসর যাপন করিব", "আমি গল্প করিতে ভালবাসি, কিন্তু এক বৎসর মৌনী থাকিব",—ইত্যাদি সহস্র কর্ম দ্বারা ইচ্ছা-শক্তি প্রবল করিতে পারা যায়। আমার প্রয়োজন নাই, তথাপি ছয়মাস প্রত্যহ, কি মাসে মাসে এক কি দুই নির্দিষ্ট

দিনে এই কর্ম করিব, শুভকামনায় এইরূপ প্রতিজ্ঞা পালন দ্বারা মনে বল আসে। আমি পারি, অন্যের কষ্টকর হউক, আমি পারি, এই আত্মশক্তি জাগাইবার নিমিত্ত ব্রতগ্রহণ একান্ত কর্তব্য। ইষ্টদেবের নামে ব্রত পালন করিলে তিনিই ব্রতীকে পালনের কষ্ট হইতে রক্ষা করেন। বালকের পক্ষে ব্রহ্মচর্য এইরূপ ব্রত। কঠিন বলিয়াই ইহা যথাসাধ্য পালন করিতে হইবে। আচার অভ্যাসের গৌণ ফলও তাই। বিদ্যার জাহাজ, ও জ্ঞানের ভাণ্ডার হওয়া অপেক্ষা সুচরিত-অভ্যাস লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ, সদাচার ও সদ্ব্যবহার যাবতীয় ধর্মের মূল। হিন্দুর নিকট ধর্মই এই।

সমাজ-ব্যতিরিক্ত শিক্ষায় অকল্যাণ

কিন্তু শিক্ষার যে প্রস্তাব করিতে যাইতেছি, তাহা কেবল হিন্দুর নিমিত্ত নহে। আমি মুসলমান ধর্মের কিছু জানি না। কিন্তু সে ধর্মেও উপবাস আছে. হয়ত ব্রতগ্রহণও আছে। কারণ ইন্দ্রিয়-সুখে রত থাকিয়া আধ্যাত্মিক সাধন হইতে পারে না। তথাপি হিন্দুর পর্ব পূজা, ব্রত উপবাস, প্রভৃতি হিন্দুর পুত্রের শিক্ষার পক্ষে যেমন মূল্যবান, অন্যের পক্ষে তেমন হইতে পারে না। অথচ এসব বাদ দিয়া পুত্রকে দ্বীপান্তরে নির্বাসিত করিতে পারা যায় না। এখন ধরিয়া রাখা হইয়াছে, পুত্রের আধ্যাত্মিক শিক্ষা তাহার বাড়ীতে হইতেছে। যদি বাড়ীর সহিত ইস্কুলের যোগ থাকিত, যদি দুই-ই এক শরীরের দুই অঙ্গ হইত, তাহা হইলে কর্ম-বিভাগে ক্ষতি হইত না; ইস্কুলে বুদ্ধির, বাড়ীতে দেহ ও আত্মার বিকাশের চেষ্টা থাকিত। কিন্তু ইস্কুলের শিক্ষা সমাজ-ব্যতিরিক্ত শিক্ষা। কেবল তাহা নহে, সে শিক্ষা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য ধর্মব্যতিকীর্ণ শিক্ষা। এই ব্যবস্থায় হিন্দুর ছেলে ও মুসলমানের ছেলে সে সভ্যতার প্রতি লোলুপ হইতেছে। বড় হইয়া জ্ঞানবান্ হইয়া সে ধর্মান্তর গ্রহণ করুক, কিন্তু তাহার কাঁচা বয়সে তাহাকে মাতাপিতার ধর্মে পালিত হইতেই হইবে। কেহ সে ধর্মকে কুসংস্কার বলুক, অন্ধবিশ্বাস বলুক, সে বিচার তাহার মাতাপিতার, পুত্রকন্যার নহে, রাজারও নহে।

ধর্মশিক্ষা।

বর্তমান শিক্ষা যে সর্বাঙ্গীন হইতেছে না, তাহা সবাই বুঝিতেছি। কেন হইতেছে না, তাহাও বুঝি। রাজা বিধর্মী;

দেশের প্রজাও একধর্মী নহে, ব্যাপক অর্থে (কেবল religion অর্থে নহে) ধর্ম শব্দ প্রয়োগ করিতেছি। আচার-ব্যবহার সমাজের লিঙ্গ (distinguishing mark)। নিজের সম্বন্ধে যাহা করি, তাহা আচার। ইষ্টদেবের পূজা, পিতৃপুরুষের তর্পণ; বিবাহও ইহার অন্তর্গত। পরের সম্বন্ধে যাহা করি, তাহা ব্যবহার। ব্যবহার আইনের অন্তর্গত। রাজা প্রজার ব্যবহার নিয়মিত করেন; ব্যবহার-ভঙ্গে দণ্ড বিধান করেন, এবং ব্যবহারাভিজ্ঞ ব্যবহারাজীবের সাহায্যে ব্যবহারের বিচার করেন। রাজা বিধর্মী হওয়াতে প্রজার ব্যবহার ধর্মের বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান বিচারালয় আর ধর্মাধিকরণ বলিতে পারা যায় না। অথচ শাস্ত্র চাই; কারণ, শাস্ত্রহীন সমাজ ও রাজশাসনহীন রাজ্য, কর্ণহীন নৌকার তুল্য প্রমাদের অতল জলে নিমগ্ন হয়। আর, এ কথাও কি সত্য নয়, গর্ভচ্যুত শিশু নিজে নিজে পণ্ডিত হয় না?

শাস্ত্রশিক্ষা।

লোকে শাস্ত্র শব্দের অর্থ জানে না। এখন ইহার প্রতি বিদ্বেষভাব জন্মিয়াছে। তাহারা মনে করে যে শাস্ত্র শাস্ত্র, ধর্ম ধর্ম, করিয়া দেশটা অধঃপাতে গিয়াছে, এই মরণ-বাঁচনের দিনে পুত্র-কন্যাকে সেই শাস্ত্রের সেই ধর্মের দাসত্ব শিখাইতে হইবে? আমি বলি, ধর্ম চাই, শাস্ত্র চাই; হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে লাফাইয়া বেড়াইলে হাত-পা ভাঙিতে থাকিবে, পতনই চলিতে থাকিবে, উত্থান হইবে না। কার বলে সমাজকে বলবান্ করিবে, ভারতের চব্বিশ কোটি হিন্দুর দ্বিজত্ব ঘটিতে পারিবে? অর্থ চাই, অর্থকরী শিক্ষা চাই বলিয়া মানুষগুলাকে কলে পরিণত করিতে চাও কি? রজতমুদ্রা যদি পরমার্থ হয়, তাহা হইলেও আত্মহীন কলের মুখ দিয়া সে রজত বমিত হইতে থাকিবে না। মরাকে বাঁচাইতে চাও; অথচ মৃতসঞ্জীবনী সুরা পান করিতে দিবে না? ধর্মের ও শাস্ত্রের, বিশেষতঃ স্মৃতি-শাস্ত্রের প্রয়োজন আছে কি না, ভাবিয়া দেখ। নানা মুনির নানা মত দেখিয়া স্থির চিন্তা হইতে পলায়ন করিলে চলিবে কি? জাপানও ফাঁপরে পড়িয়াছিল এবং হযবরল করিয়া কথাটা চাপা দিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বাঁধন ভরসা করিয়া বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে নূতন ধর্ম (morals) শিক্ষা দিতেছে. তাহা ত পর্যাপ্ত হয় নাই। চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই

দ্বিতীয় জর্মানী হইয়া লোলুপ দৃষ্টিতে আত্মতুষ্টি খুঁজিতেছে। জাপান ফাঁপরে পড়িয়া বিলাতী সভ্যতার অনুবর্তী হইয়াছে। কিন্তু আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রে ও শক্তিতন্ত্রে সনাতন বলিয়া কিছু আছে। দ্বেষরাগাদিহীন (unbiassed) সৎ ও বিদ্বান্ যে বিধি নিত্য পালন করেন এবং যাহা তাহাঁর হৃদয় শ্রেয়ঃ বলিয়া অনুমোদন করে, এমন শাস্ত্র নিশ্চয় সনাতন। এখন দেখি, ইস্কুলে good conduct জন্য prize দেওয়া হয়। যে ছেলেরা পাঁচ ছয় ঘণ্টা বোবার মতন চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, যাহারা হাঁ-তে থাকে না, না-তেও থাকে না, কিন্তু ছেলেয় ছেলেয় দুষ্টামি করিলে শিক্ষকের নিকট গোয়েন্দাগিরি করে, তাহারা good conductএর prize পায়। কিন্তু আমি যে শিক্ষাশালার কথা বলিতেছি তাহাতে "প্রাইজ" থাকিবে না, ছেলেরা বোবা হইবে না, বালক-বিশেষকে চর করা হইবে না, কেহ অনুচিত দুষ্টুও হইবে না। আচার ও ব্যবহার অভ্যাস করাইয়া, মুখে বলিয়া নহে, কাজে করাইয়া শিক্ষার অঙ্গ করিতে চাই।

আচার ও ব্যবহার শিক্ষা।

এখানে আর-একটা কথা বোঝাপড়া হইয়া যাউক। পুত্রকন্যা-শিক্ষা অবশ্যক (compulsory) করিতে চান; কোন্ অধিকারে? সে অধিকারে বিনা বেতনে শিক্ষা দিতে হইবে। কারণ, সে শিক্ষা পিতা বা অন্য অভিরক্ষিতার (guardian) স্বেচ্ছাধীন থাকিবে না। অতএব এমন শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে পুত্রকন্যা 'মানুষ' হয়। মানুষ করিতে গেলেই ধর্মশিক্ষাও অবশ্যক করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, আচার ও ব্যবহার-শিক্ষাই ধর্মশিক্ষার আদি।

এই শিক্ষা বাড়ীর উপরে ছাড়িয়া দিলে বর্তমান অবস্থায় চলিয়া আসিব। ইহার দুই কারণ। (১) যাহাঁরা ইংরেজী-শিক্ষিত হইয়াছেন, তাহাঁরা সনাতন-ধর্ম-শিক্ষার প্রায় কিছুই জানেন না। (২) যাহারা অশিক্ষিত, তাহারা ধর্মশিক্ষা দিতে গিয়া আচারকেই বড় করিয়া তুলিবে, কিংবা কুলাচার ও দেশাচারকেই আচার মনে করিবে। অবশ্য একথা সত্য, প্রচলিত যুক্তিহীন আচার অধিককাল টিকিবে না। ট্রামে ও রেলে ও ষ্টীমারে জন্মগত জাতির লঘু-গুরু-ভেদ ঘুচাইয়া দিতেছে, কুলীন ব্রাহ্মণের পাশে একাসনে অবনত অকুলীন বসিয়া যাইতেছে। রাজদণ্ডের ভয়ে ম্লেচ্ছ বিচারকের বিচার মানিতে হইতেছে। তাহাঁকে

(সেলাম নামে) নমস্কারও করিতে হইতেছে। প্রায় আটশত বৎসর, চৌদ্দপুরুষ নয়, বত্রিশ পুরুষ, এই দুরদৃষ্ট ঘটিয়াছে। কাজেই ঘরে বাহিরে সঙ্গতি রাখিয়া চলিতে গেলে যাহা নিত্যাচার, যাহা নিত্য ব্যবহার, তাহা আশ্রয় করিতে হইবে। সকলের বাড়ীতে এই শিক্ষা হইবে কি না সন্দেহ।

গুরুকুলে শিক্ষা।

নিত্যাচার ও নিত্য-ব্যবহার শিক্ষা সকলের বাড়ীতে সেকালেও হইত না। তাই শিষ্যকে গুরুকুলে (কুল=গৃহ) থাকিতে হইত। বিহারও বৃহৎ গুরুকুল। মঠ শব্দের অর্থ ছাত্রনিবাস। এখানেই আচার, বিনয় (discipline), বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা (fame), বৃত্তি (occupation), নিষ্ঠা (devotion to work), তপঃ (moral virtue), প্রভৃতি কুলীনের কাম্যগুণ জন্মিতে পারে। বাড়ীর শিক্ষা, ব্যক্তির শিক্ষা; গুরুগৃহে শিক্ষা, সমূহের শিক্ষা। দ্বিবিধ শিক্ষার মধ্যে, গুরুকুলে শিক্ষাই ভাল। এখন একা একা তিষ্ঠিবার জো নাই। এই বুঝিয়াই বিধি হইতেছে, আদ্যশিক্ষা সকলকেই পাইতে হইবে। মাতাপিতার মতামত-জিজ্ঞাসা নাই; ছেলে তাহাঁদের হইলেও রাজ্যের। যে ছেলে রাজ্যের, সে ছেলের শিক্ষা-দীক্ষা রাজার হাতে। অতএব তাহার শিক্ষা, সমূহের শিক্ষা হইলেই রাজ্যের মঙ্গল। গুরুকুলে এই শিক্ষার যেমন সুবিধা, বাড়ীতে তেমন হইতে পারে না; গুরুকুলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে ঘণ্টায় যে আচরণ, সে ঘণ্টায় সে আচরণ ঘড়ীর কাঁটার মতন চলিতে থাকে। ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা-ত্যাগ; সে সময়ের নিদ্রালস্য সতীর্থের উত্থানে পলায়ন করে। আরও সুবিধা, গুরুগৃহের যাবতীয় কর্ম ছাত্র কিংবা ছাত্রীকেই করিতে হইবে। কারণ, ভৃত্য নাই। ঘর-দুয়ার ঝাঁটানা, নিকানা, বাসন-কোশন মাজাধোয়া, নদী হইতে জল আনা, হাট করা, রান্না-বান্না প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম বাল্যকাল হইতে করিতে করিতে একদিকে ছাত্র ও ছাত্রীর দেহ শ্রম-ক্ষম হইতে থাকিবে, অন্যদিকে এসব নিত্যকর্মে হেয়ত্বজ্ঞান বা লজ্জা-বোধ জন্মিতে পারিবে না। এক এক গৃহে আটদশ জনের অধিক থাকিবে না। ইহাদের পরস্পর সখ্য দ্বারা, পরস্পর সাহচর্য দ্বারা সমূহের ইষ্টানিষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকিবে। কুলপতির আজ্ঞাধীনে থাকিয়া এক শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া কর্মে অভ্যাস জন্মিলে পরে বড় হইয়া নেতার অধীনে কর্ম করিবার প্রবৃত্তি

সহজে আসিতে পারিবে। বিশেষতঃ যে ব্যায়াম ও আহার না করাইলে বাঙ্গালী জাতির পুত্রকন্যার কল্যাণ নাই, তাহা এইরূপ গুরুকুল ব্যতীত বাড়ীতে হইতে পারিবে না। ইংরেজ জাতির কৃপায় রবিবারে ছুটি, গ্রীষ্মকালে ছুটি, বিদ্যালয়ের বালকবালিকারা এখন ভোগ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে নিত্যকর্মের পরিবর্তন চাই; কিন্তু সেটা পর্বে পর্বে হইলে, গ্রীষ্মে না হইয়া বর্ষাকালে হইলে, একদিকে পর্বের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম হইবে, অন্যদিকে বর্ষাকালের দুর্যোগ-হেতু শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিতে পারিবে না। নয় বৎসর বয়স পর্যন্ত বালকবালিকা অবশ্য বাড়ীতে থাকিবে। তারপর গুরুকুলে বাস যত হয়, ততই ভাল। সর্বত্র এই নিয়ম চলিতে পারিবে না; কিন্তু এখানে মানস বর্ণনা করা যাইতেছে।

বাঙ্গালীর দোষ গুণ।

পূর্বে দেখা গিয়াছে, এমন শিক্ষা চাই, যদ্দ্বারা বাঙ্গালীজাতির দোষ যথাসাধ্য শোধিত হইতে পারিবে, এবং গুণ বিকসিত হইয়া সর্বাঙ্গপূর্ণ হইতে পারিবে। কিন্তু বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর দোষ গুণ ঠিক ধরিতে পারিব কি না, সন্দেহ। না ধরিলে শিক্ষার বিষয় ও ক্রমও ঠিক হইতে পারিবে না। অতএব ভুলের শঙ্কা থাকিলেও চেষ্টা করিতেছি।

(১) দেহ।

বাঙ্গালী শীর্ণ ও খর্বদেহ; বাঙ্গালী দুর্বল। ইহার কারণ জানা চাই, কিন্তু জানা কঠিন। মেলেরিয়া, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, ব্যায়ামাভাব বা দেশের উষ্ণ আর্দ্র বায়ু, বোধ হয় সব মিলিয়া জাতির দৈহিক অবনতি ঘটাইয়াছে। অবশ্য আদি বংশের দোষও থাকিতে পারে। তথাপি মনে পড়ে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী এত হীনবীর্য ছিল না। জাপানীও আকারে বাঙ্গালীর তুল্য, তাহার অন্নও বাঙ্গালীর তুল্য। কিন্তু প্রভেদ—তাহার দেশে মেলেরিয়া নাই, পুষ্টিকর বলকর অন্নও অপ্রচুর হয় নাই; আর প্রভেদ, তাহারা পুত্র-কন্যাকে রীতিমত ব্যায়াম না করাইয়া ছাড়ে না। দুর্বল বলিয়া বাঙ্গালী কার্যবিমুখ হইয়া পড়ে। আহার ও ব্যায়াম এই রোগের ঔষধ।

(২) চিত্ত।

বাঙ্গালী সহসা প্রবৃত্ত, সহসা নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ তাল-পাতার তুল্য ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু পরে নিবিয়া যায়। ভাবিয়া-চিন্তিয়া ধরে না, ভাবিয়া-চিন্তিয়া ছাড়ে না। অর্থাৎ বাঙ্গালী হুজুগে মাতে। এই দোষ-হেতু বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান স্থায়ী হয় না। জাপানী জাতিটাও নাকি বাঙ্গালীর তুল্য চলচিত্ত ছিল, কিন্তু আপনাকে বাগাইয়া আনিয়াছে। এই দোষের প্রতিকার বড় সহজ নহে। বোধ হয় নিত্য ক্লেশকর কর্ম (drudgery) করিতে করিতে ও ইচ্ছাশক্তির বিকাশে চলচিত্ততার প্রতিষেধ হইতে পারে। দেখা যায়, গ্রামের লোক সহজে হুজুগে মাতে না। তাহারা স্বভাবতঃ রক্ষাশীল। কাজেই ফলাফল স্পষ্ট বুঝিতে না পারিলে নূতন কাজে হাত দেয় না। কেহ কেহ বলেন, আমাদের যুবকেরা ভাব-প্রবণ। ইহা অসাধারণ নহে। যৌবনের চাঞ্চল্য সর্বজনবিদিত। ভাব-প্রবণ না হইলে বরং দোষের হইত। যৌবনে ভোগ-লালসা যেমন প্রবল হয়, ত্যাগ, এমন কি আত্মত্যাগও তেমন সহজ। এই দুই বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশেই যৌবন মহনীয় হইয়াছে। তথাপি বাঙ্গালী যুবার ভাব-প্রবণতা অধিক হইতে দেওয়া কর্তব্য নহে। কাঁচা বয়সে দর্শন-পাঠ ঠিক মনে হয় না। বিশেষতঃ ইদানীর ইয়ুরোপী বিশৃঙ্খলবৃত্তি নায়ক-নায়িকার উপন্যাস বিষবৎ পরিবর্জন কর্তব্য।

(৩) আত্ম-সম্মান।

বাঙ্গালী অভিমানী। ইহা একটা বড় গুণ বটে, কিন্তু অতিবোধে দর্প ও ঔদ্ধত্য আসে। অশিষ্টের দর্প-হেতু বাঙ্গালী তাহার প্রতিবেশীর বিরাগভাজন হইয়াছে। তথাপি বাঙ্গালী যাহা 'ছোট কাজ', হেয় কাজ মনে করে, সে কাজ সহজে করে না। বাঙ্গালী কুলী হয় না। ঘরে অন্ন আছে বলিয়া নহে; কোন্ বাঙ্গালীকে খাটিতে না হয়? গ্রাম-সম্বন্ধ চলিয়া যাইতেছে বলিয়া বাঙ্গালী বাড়ীর চাকর হইতেছে না। পঞ্জাবের শিখ কলিকাতায় 'মোটর' রথের সারথি হইতেছে; বেতন অল্প নয়; কিন্তু বাঙ্গালী কয়জন? ইদানী কিছু কিছু হইতেছে বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস এই কর্মে তাহারা লজ্জা বোধ করে। বাঙ্গালীর কেরাণী হইবার কারণও তাই। কেরাণী প্রাচীনকালের 'করণিক' (officer); দাস (menial

servant) নহে। তা ছাড়া, যিনি যাহাই বলুন, বেতন লইয়া পরের কাজে দেহ খাটাইয়া কে কোথায় সুখ অনুভব করে? দেহের কর্ম চিরদিনই হেয়, বুদ্ধির কর্ম চিরদিনই প্রেয় বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। আমেরিকা নূতন রাজ্য; সেখানে পরে কি দাঁড়ায় কে জানে। আমি দৈহিক শ্রমের নিন্দা করিতেছি না; বাঙ্গালীর কেরাণী হইবার প্রবৃত্তির মূল খুঁজিতেছি। আমরা একটা কথা ভুলিয়া যাই। যাহার দেহ ও মন মাত্র পুঁজি, তাহাকে ভবের হাটে এই দুই লইয়াই ব্যাপার করিতে হইবে। কেরাণী ও মাষ্টারি, ওকালতি ও ডাক্তারি, ইত্যাদি কর্মে মানুষটি থাকিলেই চলে। লোকে বলে ব্যবসা কর, বাণিজ্য কর, বৈজ্ঞানিক চাষ কর। কিন্তু এসব কর্ম, চাকরির তুল্য একপাদ নহে, প্রায়ই ত্রিপাদ কি চতুষ্পাদ।

অভিমান প্রকৃত বস্তুতে আরোপিত হইলে চিত্তবলের সঙ্গে সঙ্গে কর্মশক্তি প্রকাশ করে। সংবাদপত্রে দেখি, প্রায় দেড় হাজার যুবা রাজদ্বেষী সন্দেহে কারারুদ্ধ হইয়াছিল। ইহারা ধন চায় নাই, মান চায় নাই। কি অভিমানে মরিতে গিয়াছিল? যে বাঙ্গালী কখনও অস্ত্রের মুখ দেখে নাই, কোন্ সাহসে ইয়ুরোপের রণক্ষেত্রে গোলার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল? নির্বোধের সাহস ত নয়। অভিমানের ভালর দিকে এই। মন্দের দিকে, সাহেব সাজিবার চেষ্টা। সাহেবে মান পায়; অন্য উপায় না দেখিয়া মানী বাঙ্গালী সাহেবের অনুপযুক্ত পরিচ্ছদ ও রীতি নীতি অনুকরিতেছে। বড়র অনুকরণ মানুষ মাত্রেই স্বাভাবিক; কারণ তাহাই শিক্ষার উপায়। কিন্তু বাহ্য আবরণ অপেক্ষা বড় কিছু আছে, বাল্যাবধি তাহার আভাস পাইলে বাঙ্গালী মানুষ হইয়া উঠিবে। এক অন্তরীয় ও এক উত্তরীয় পরিলেও হিন্দুর গর্ব করিবার অনেক আছে, বাঙ্গালীরও আছে। দুঃখের বিষয়, এই ইতিহাস, প্রাচীন অবদানের ইতিহাস, এখনও রচিত হয় নাই, কর্ম-প্রবৃত্তির নির্মল ও প্রাণকর উৎস এখনও অদৃশ্য হইয়া আছে।

(৪) উদারতা।

বাঙ্গালী নির্ভীক ও উদার। দেহের বলে কুলায় না বলিয়া তাহার ভীরু অপবাদ রটিয়াছে। যেদিন দেহে বল আসিবে, সেদিন তাহার মনের বল আরও প্রকাশিত হইবে। স্থৈর্য, বলবানের

লক্ষণ, কাপুরুষের নহে। বাঙ্গালী নূতন পথে চলিতে ডরায় না। শক্তি-তন্ত্রের উপাসক হইয়া মহাশক্তিকে জগতের অম্বা জ্ঞান করে, অসুর-মর্দিনী সিংহবাহিনীকে কন্যারূপে অর্চনা করে। তাই তাহারই কণ্ঠে বন্দে মাতরম্ উচ্চারণ সহজ হইয়াছে। বাঙ্গালী গাঁয়ে গাঁয়ে পাড়ায় পাড়ায় দলাদলি করে; কিন্তু যে জাতিভেদের প্রচণ্ড উত্তাপে ভারতের অপর প্রদেশ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, বঙ্গে সে উত্তাপ কত মৃদু তাহা দেশভ্রমণ না করিলে বুঝিতে পারা যায় না। উদার বলিয়া বাঙ্গালী গুণের আদর করে, এবং বিদেশী বিধর্মী হইলেও তাহার অনুরক্ত হইয়া পড়ে।

(৫) বুদ্ধি।

বাঙ্গালী বুদ্ধিমান্। কিন্তু ইহাতে দোষও হইয়াছে, বুদ্ধির জোরে কেল্লা ফতে করিবার প্রবৃত্তি দমন করিতে পারে না। অল্পদর্শী মনে করে, ইংরেজের সংসর্গে বহুকাল আছে বলিয়া বাঙ্গালীর বুদ্ধি খুলিয়াছে। কিন্তু খোলা বুদ্ধির লক্ষণ আর-এক প্রকার। আরও আগে হইতে মাদ্রাজী ইংরেজের সংসর্গে আসিয়াছে। বাঙ্গালী ইংরেজের বুদ্ধি পাইলে বড় হইয়া উঠিত। ইংরেজ বণিকের সংসর্গে অন্ততঃ অর্থে বড় হইতে পারিত। অনুকরণে দক্ষ হইলে রাজধানী কলিকাতায়, যেখানে বিদেশী বণিকের বৃহৎ অট্টালিকা তাহার বাণিজ্য ঘোষণা করিতেছে, কল-কারখানার চিমনীর ধূম সর্বদা নির্গত হইতেছে, এবং যেখানে শত শত বাঙ্গালী কাজ করিতেছে, সেখানে এত দেখিয়াও অনুকরণ কই? বাঙ্গালী সুখাভিলাষী; কিন্তু পৃথিবীর কোন্ জাতি নয়?

আর একটা কথা ভাবিবার আছে। বাঙ্গালী যদি বুদ্ধিমান্, তাহা হইলে তাহার সর্জনা (originality) তাহার উদ্ভাবনা (inventiveness) শক্তির পরিচয় কই? আমার বিশ্বাস, ইংরেজী পড়ার চাপে এই দুই শক্তি চাপা পড়িয়াছে। এ বিষয় পরে দেখাইতেছি। আরও কারণ আছে। বাঙ্গালীর বুদ্ধি বিশ্লেষণে উন্মুখ, সংশ্লেষণে বিমুখ। পরের যুক্তি খণ্ডন করিতে ধাবিত হয়, কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞা পূরণ করে না। নানা ব্যাপারে বাঙ্গালীর বিশ্লেষণী বুদ্ধির লক্ষণ পাওয়া যায়। বাঙ্গালী 'নেই-আঁকড়ো', ন্যায়শাস্ত্রের তর্ক আঁকড়াইয়া থাকে, কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করে

না। এই কারণে চলিত কথায় বলে,—হিক্‌মতে চীন, হুজ্জুতে বাঙ্গালী। এই দোষেই বাঙ্গালী মজিয়াছে ও মজিতেছে। তাহার সহিত তর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারা যায় না। সেই দোষেই বাঙ্গালী কাহারও আজ্ঞাধীন হইয়া কাজ করিতে পারে না, একত্র মিলিত হইতে পারে না; প্রত্যেকে মনে করে সে যেমন বুঝিয়াছে আর কেহ তেমন বোঝে না। বিশ্লেষণী বুদ্ধিতে সমগ্র দেখিতে দেয় না। এই হেতু বাঙ্গালী বৃহৎ কলা বা বাণিজ্য চালাইতে পারে না, কর্মের ব্যবস্থাপক (organiser) হইতে পারে না। ব্যাপারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় উত্তম বুঝিতে, করিতে, চালাইতে পারে; কিন্তু সেসব একত্র করিতে হইলে সে দিশাহারা হইয়া পড়ে। বাঙ্গালীর কুশাগ্রবুদ্ধির নিকট অভেদ্য কিছু নাই; কিন্তু স্থূলের নিকট কুশ পরাজিত হয়; আর সংসারে ভেদন অপেক্ষা যোজন অধিক লাগে। কারণ বিশ্লেষণী শক্তি ভঞ্জন-শক্তি; সংশ্লেষণী, নির্মাণ-শক্তি। আশ্চর্যের কথা, বঙ্গদেশে অদ্যাপি অর্থ-নীতিবিৎ জন্মগ্রহণ করেন নাই! কারণ পরিসংখ্যানের (statistics) পরে যে ব্যাপক দৃষ্টি চাই, তাহার অভাব ঘটে। অবশ্য খণ্ডদৃষ্টিই সহজ, কিন্তু অখণ্ডদৃষ্টি-লাভের নিমিত্ত একাগ্রতা ও অভ্যাস চাই। ইহা এক প্রকার যোগ (concentration of mind), এ চলচিত্ততায় অসাধ্য।

ইংরেজী ভাষায় শিক্ষার দোষ।

ইংরেজী ভাষা দ্বারা বিদ্যা ও জ্ঞান লাভ করিতে গিয়া কি ক্ষতি হইতেছে, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। প্রত্যহ দেখিতেছি বলিয়া ইহার পরিমাণ পাইতেছি না।

(১) শক্তিহানি।

দেখি, বালক ও যুবক কাতারে কাতারে ইংরেজী ইস্কুল ও কলেজের পথে ব্যাকুলভাবে ছুটিয়াছে, বার-চৌদ্দ-ষোল-বর্ষব্যাপী তপস্যায় বসিয়া গিয়াছে। অর্থ ও কামের নিমিত্ত ব্যগ্রতা বুঝিতে পারি; কিন্তু যাহার অর্থফল অনিশ্চিত তাহার প্রতি এমন আসক্তি অন্য দেশে দুর্লভ। শুনিয়াছি, জর্মানী ও ইদানী জাপান ছাড়া ইহার তুলনা নাই। কিন্তু তাহাদের পথ সোজা; আমাদের পথ কাঁটার বেড়া দিয়া ঘেরা। পূর্বকালে সমস্থানীয় দুর্গ বেউড়-বাঁশের বেষ্টনে

দুর্ভেদ্য করা হইত। ধন্য আমাদের ধীরত্ব ও বীরত্ব; আমরা সুকুমার বালক ও বালিকাকেও নির্বিকার চিত্তে সেই কাঁটার বনে নিক্ষেপ করিতেছি। ধন্য তাহারা, যে, মরি-বাঁচি পণ করিয়া, সিদ্ধ তপস্বীর ন্যায়, শরীর দিয়া কাঁটার অগ্র ভগ্ন করিতেছে! দেশের মধ্যশ্রেণীর কি প্রভূত শক্তি এইরূপে অপব্যয়িত হইতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখিতেছি না! চাই বিদ্যা, চাই জ্ঞান। কিন্তু এ কি বিড়ম্বনা, অন্যের ভাষা দিয়া তাহা লাভ করিতে হইবে? হয়ত ভবিষ্যৎ প্রত্নবেত্তা পুরাতন জীর্ণ নিবন্ধ ঘাঁটিয়া আবিষ্কার করিবেন, চাপ্‌কান কাটিয়া কোট করিতে গিয়া তাহাদের পিতামহগণের মতি-ভ্রম ঘটিয়াছিল। কারণ, শুনিতে পাই, পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রচার কামনায় ইংরেজী-শেখার বিধি হয় নাই।

ফলও প্রত্যক্ষ হইতেছে। মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডব বহুকাল রাজ্যসুখ সম্ভোগের পর স্বর্গারোহণে কৃত-সংকল্প হইলেন। দ্রৌপদীও সঙ্গে চলিলেন। কিন্তু হিমালয়ের বন্ধুর শৈলে, হিমানীর অসহ্য শীতে, কিছুদূর চড়িতে না চড়িতে পথে পতিত হইলেন, আর উঠিলেন না। আমাদের বালিকা বিদ্যালয়ে যে-বালিকা চড়িতে যাইতেছে, তাহারও দশা দ্রৌপদীর তুল্য হইতেছে, শরীর ভাঙিয়া যাইতেছে। হিমালয়ে চড়িতে গিয়া কোমলদেহ কনিষ্ঠ পাণ্ডবদ্বয়ও যে গতায়ু হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য কি? পরাক্রমশালী ভীমার্জুনেরও নিষ্কৃতি হয় নাই। মহাভারতে আছে, একা যুধিষ্ঠির, বোধ হয় সংযমগুণে, স্বশরীরে স্বর্গে পহুঁছিতে পারিয়াছিলেন। ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা দ্বারা এইটি প্রথম ফল। বোধ হয় তিন জনের মধ্যে দুই জন অকাল-বৃদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। কত জনের দৃষ্টি ক্ষীণ হইতেছে, ভাবিয়া দেখুন।

(২) জ্ঞানহানি।

দ্বিতীয় ফল আরও ভয়ানক। বিদ্যার পরিপাক দূরে থাক, ভক্ষিত বিদ্যা কণ্ঠদেশ ছাড়িয়া অন্ননালীতেও পড়িতেছে না। বিদ্যার ফল জ্ঞান। এমন জ্ঞান, যে জ্ঞানে দিবাকে দিন বলিয়া বিশ্বাস করি, এবং সেই অনুসারে কাজ করি। কানে শোনা কথা নহে, কেতাবী বয়দ্ নহে; এমন জ্ঞান যাহাতে সুঘ্রাণ সুদৃশ্য অন্নে বিষ আছে জানিলে ক্ষুধার্তও সে অন্ন বর্জন করে। যে জ্ঞান কর্মের প্রবর্তক

না হয়, সে জ্ঞান মিথ্যা। ইহার একমাত্র কারণ, বিদ্যার্থীকে দেশে না রাখিয়া বিদেশে বিচরণ করিতে পাঠাইতেছি, এক কাল্পনিক প্রাণীতে পরিণত করিতেছি। ফলে, সংসারের এক আঁচড়ে তাহার লব্ধজ্ঞান অদৃশ্য হইতেছে। ইংরেজী-শিক্ষিত জনকয়েক ছাড়া আর কেহ ইংরেজী লেখা-পড়ার ধার দিয়া যায় না, পনর-ষোল বৎসরের কঠোর তপস্যা সব ভুলিয়া যায়। কেহ বা বুভুক্ষিত তৃষিত জনের ন্যায় মাতৃস্তন্যের নিমিত্ত ব্যাকুল হয়, হয়ত পায় না; পাইলেও দেশী-বিলাতীর মিল করিতে পারে না।

(৩) আত্মহানি।

তৃতীয় ফল আরও ভয়ানক। দিবারাত্র বৎসরের পর বৎসর ইংরেজী ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাহার দেহে ফিরিঙ্গীর ভূত প্রবেশ করে। তাহার সত্তা লুপ্ত হয়; সে মনে করে, সে ফিরিঙ্গী। তাহার আচারে ও ব্যবহারে, তাহার চিন্তায়, নিজে আর থাকে না। যিনি ভূতে-পাওয়া রোগী দেখিয়াছেন, তিনি বুঝিবেন ইচ্ছাশক্তি কি অদম্য বলে ভূতের ইচ্ছাতে পরিণত হয়। ভাষাশিক্ষা মাত্রেই অন্যের অনুকরণ। ইহার আদ্যে মুখস্থ, মধ্যে মুখস্থ, অন্তে মুখস্থ। ভাষার শব্দ মুখস্থ, অর্থ মুখস্থ, রচনা মুখস্থ, রীতি মুখস্থ, এমন কি ভাবও মুখস্থ না করিলে সে ভাষা বুঝিতে ও লিখিতে পারা যায় না। অর্থাৎ নিজের করিয়া লইতে হইলে পরের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়। অনুকরণে এই যে অভ্যাস হয়, তাহার ফল ভয়ানক। কোথায় বা সর্জনা, কোথায় বা উদ্ভাবনা, কোথায় বা স্বাধীনচিন্তা! চিত্তের দাসত্বের তুল্য শোচনীয় কি আছে? এই যে দশা হইয়াছে, তাহা হইতে মুক্তির উপায় কি?

উপায় চিন্তা। শিক্ষাপদ্ধতি

অর্থকরী শিক্ষা আবশ্যক।

যে দুঃসময় পড়িয়াছে, দেশের ধনের রক্ষা ও বৃদ্ধি ব্যতীত বাঁচিবার উপায় নাই। যদি লোকে উৎপন্ন বৃদ্ধি করিতে পারে, চাষে দশ মণের জায়গায় পনর মণ ফলাইতে পারে, এইরূপ অন্যান্য জীবিকায় পারে, তবেই রক্ষা। কিন্তু পারিবে কি?

দেশে ধনাগমের তিন উপায়—কর্ষণ, কলা, ক্রয়। আমরা বলিতেছি, চাষ কর, বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রবর্তিত কর। ভূমি হইতে ধাতু কর্ষণ কর, আকর-কর্ম শেখ। বিশ্বকর্মশালা কর, কলা-বিদ্যালয় খোল, বাণিজ্য শেখাও।

চেষ্টাও কিছু কিছু হইতেছে। কয়েকটা জেলায় 'বৈজ্ঞানিক' কৃষির আদর্শ রাখা হইয়াছে। বঙ্গের সন্নিকটে কৃষি-বিদ্যালয় আছে; ঢাকাতে আর-একটা প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে; সেখানে আকরবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ঢাকাতেও আর-একটা বিদ্যালয় খুলিবার উদ্‌যোগ হইতেছে; কলিকাতায় কলাশিল্পশালা স্থাপনের কথা উঠিয়াছে। কলিকাতা বিদ্যামহাপীঠে বাণিজ্যবিদ্যা শিখাইবারও প্রস্তাব হইয়াছে। কাশিমবাজারের চিরবদান্য মহারাজা ইতিমধ্যে কলিকাতায় বিশ্বকর্মশালা (polytechnic) খুলিয়াছেন, বহরমপুরে তাঁহার কলেজে বাণিজ্যবিদ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। স্যর রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় মূর্তবিজ্ঞান (applied science) শিখাইবার নিমিত্ত প্রচুর অর্থদান করিয়াছেন। বেঙ্গল টেক্‌নিকাল ইনষ্টিটিউট অনেক দিন কলা শিক্ষা দিতেছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি প্রয়াসে কিছু-না-কিছু ফল হইতেছে। কিন্তু কত জনের শিক্ষা হইতেছে, কত জনের বা হইবে? কত কালেই বা হইবে? এদিকে এক এক বৎসর যাইতেছে, মনে হইতেছে যেন এক এক যুগ চলিয়া যাইতেছে। উনানে হাঁড়ী চড়াইয়া ঘরে চাল নাই দেখিয়া বাজারে দৌড়াইলে যে হাস্যকর দশা ঘটে, সে দশায় আমরা পড়িয়াছি।

সমাজের নিম্নাঙ্গের শিক্ষা।

বিশেষ চিন্তা, উপরি-উক্ত প্রয়াস সমাজের উচ্চাঙ্গে, যে অঙ্গ সহজে চোখে পড়ে। যে নিম্নাঙ্গ অসাড় নির্জীবপ্রায় হইয়া রহিয়াছে, যাহাকে ভর করিয়া কোটি কোটি প্রজা দাঁড়াইয়া আছে, সে দিকে তেমন দৃষ্টি কই? যদি দশটা কৃষিবিদ্যালয়, পাঁচটা কলাবিদ্যালয় ও তিনটা বাণিজ্যবিদ্যালয় খুলিলে বঙ্গের সাড়ে চারি কোটি লোকের অন্নবস্ত্রের অভাব দূর হইবে বলিয়া বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে এতদিন টাকা কর্জ করিয়াও সে-সব খুলিতে পারা যাইত না কি? আমার বিশ্বাস, এ-সব গোষ্পদের পানিতে দেশের শুষ্ক ভূমি সিক্ত

হইবে না; ভূরি বর্ষণ চাই, জলের ছিটার কর্ম নয়। শিক্ষা-নীতির আমূল সংস্কার চাই, গ্রামের কুটীর হইতে নগরের সৌধ সুরচিত শিক্ষা-জালে ঘেরা চাই। জালের সূত্র কেমন হইবে, "শিক্ষার বীজ" প্রসঙ্গে পূর্বে তাহার আভাস দিয়াছি।

কর্ষণ, বর্ষণ ও রক্ষণ।

শিক্ষার তারতম্যে জাতি উন্নত কিংবা অবনত হয়। এই কথা আমরা এত বুঝিয়াছি যে, দেশের রাষ্ট্রনীতির উল্লেখ করিতে গেলেই শিক্ষাবিস্তার করিতে বলি, আদ্য শিক্ষা অবশ্যক (compulsory) করিতে বলি, এবং বর্তমান দৈন্যের কারণ, শিক্ষার অল্পতা বিবেচনা করি। উত্তম কর্ষণ না পাইলে ভূমি উর্বরা হয় না; আমাদের চিত্তও হয় না। কিন্তু কেবল কর্ষণ হইলেই শস্য জন্মে না; এক দিকে যথাকালে যথাপরিমাণে বর্ষণ চাই, অন্য দিকে মূষিক ও খগ ও পতঙ্গ প্রভৃতি অভ্যাপাত হইতে রক্ষণ চাই। জমিন্ ত মানবের; কর্ষণও যেন হইল; কিন্তু বর্ষণ ও রক্ষণ যে ইন্দ্রের হাতে। তা ছাড়া, রোগের নিদান আবিষ্কার এক কথা, চিকিৎসা আর-এক কথা।

কর্ষণের পূর্বে বর্ষণ।

প্রচুর বর্ষণ চাই; কতক বৃষ্টি যে খালে ও নদীতে পড়িবে না, এমন নহে। সে আশঙ্কায় অর্থব্যয়ে কৃপণ হইলে যে-ভূমি কর্ষণের ও ফলনের যোগ্য তাহাও রসসিক্ত হইতে পারিবে না। দেশকে মানুষ করিবার নিমিত্ত যে ব্যয়, সেটা ত ব্যয় নহে, সেটা পুনরাবর্তক ধন। সেটাই ব্যয়, যেটার বৃদ্ধি হয় না। যে ব্যয়ে ধন বাড়ে, সে ব্যয় খাতার ডাইন পাশে দেখা গেলেও, বাঁয়ে ধরা কর্তব্য। মহাজন ধান কিনিয়া রাখিবার সময় মনে করে না, টাকা নষ্ট হইয়া গেল। সে ধন তাহার মূলধন, যাহা বাড়িয়া বাড়িয়া দ্বিগুণ ত্রিগুণ হইতে থাকে। প্রকৃত শিক্ষায় যে ব্যয়, যাহাতে দেশের আয়ু ও আরোগ্য, শক্তি ও সামর্থ্য বাড়িয়া চলে, তাহাই ত দেশের মূলধন। অতএব আপাতব্যয়ের কাল্পনিক তর্কে ভুলিলে চলিবে না। গোড়াপত্তন ভাল করিতে হইবে; তার পর অট্টালিকা উঠাও। জানি, আমরা বীজাঙ্কুর-ন্যায়ে পড়িয়াছি; বীজ নইলে অঙ্কুর জন্মে না, অঙ্কুর নইলে বীজ হয় না। কিন্তু বীজ বিনা অন্য উপায় কই? বীজ যোগাড় করিতেই হইবে;

নতুবা মানব-জমির আবাদ দূরে থাক, জমিটাই শূন্যে মিলাইয়া যাইবে।

শিক্ষা শব্দের অর্থ।

কিন্তু শিক্ষা শিক্ষা রব করিলেই, মানব-কৃষ্টি (culture) শতবার উচ্চারণ করিলেই, তাহার ক্রিয়াপরিপাটি বুঝিতে পারা যায় না। 'শিক্ষা' বলিতে ইংরেজী শিক্ষা বুঝাইতেছে; টোলের বৃদ্ধ অধ্যাপক ও গ্রামের প্রবীণ মুখ্য 'শিক্ষিত' নহেন, কারণ তাহাঁরা ইংরেজী ভাষা শেখেন নাই। 'শিক্ষিত' শব্দের এই অপপ্রয়োগে বুঝি, আমরা বস্তুটা চিনিতে পারি নাই, একটা ছায়ার অনুসরণ করিতেছি। অথচ জানি, যার নাম শে-খা, তারই নাম শি-ক্ষা। ইহাও জানি, অভ্যাস দ্বারা অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ করিয়া, কর্ম শিখি। মানুষের এই যে শক্তি, যে শক্তি দ্বারা কর্ম অভ্যাস হইয়া যায়, দেহের বৃত্তিবিশেষে পরিণত হয়, যে কর্ম ইচ্ছাপূর্বক যত্নপূর্বক করিতে করিতে অনিচ্ছাকৃত অযত্নকৃত হইয়া পড়ে, সে শক্তি-হেতু মানুষ পশুকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

কোনও কর্ম করিতে শিখিলেই যে, সে কর্ম জা-না হয়, এমন নহে। পাচক ব্যঞ্জন রাঁধিতে শিখিয়াছে, কি মাত্রায় কি উপকরণ-যোগে কোন ব্যঞ্জন স্বাদু হয়, তাহা জানিয়াছে, ভূয়োদর্শন দ্বারা জানিয়াছে; তাহার পাককর্ম শিক্ষা হইয়াছে। কিন্তু সে জানে না, সে সে উপকরণ একত্র পাক করিলে, সে সে মাত্রায় যোগ করিলে, ব্যঞ্জন কেন সুস্বাদু হয়। এই জ্ঞানের অভাবে, তাহাকে প্রত্যেক ব্যঞ্জনের যুক্তি (recipe) পৃথক্ মনে রাখিতে হয়। তাহার জ্ঞান বিক্ষিপ্ত। সে পাককর্ম জানে, জানেও না। সে পাককর্মের সূত্র পায় নাই। পূর্বকালে জ্ঞানের সূত্রকে বিদ্যা (science) বলা হইত। ইদানী আমরা বিজ্ঞান বলিতেছি। কারণ, বিজ্ঞানে কলাকর্মও কিছু শিখিতে হয়।

অতএব দেখিতেছি, প্রথমে শিক্ষার অর্থাৎ কর্ম-অভ্যাসের প্রয়োজন। ইহার নিমিত্ত মস্তিষ্কের যত না হউক, চোখ-কানের হাত-পায়ের নিয়ন্ত্রিত কর্ম আবশ্যক। দেশের যাহারা কারু (artisan), যাহারা কৃষক, যাহারা বণিক্, তাহারা স্ব স্ব বৃত্তি এইভাবে পিতা বা খুড়া বা মামা প্রভৃতির নিকট শেখে। পাঠশালায় পাঠ পড়ে, ভালই; পাঠ শেখা গৌণ, কর্ম শেখাই মুখ্য; কারণ, জীবিকার তুল্য চিন্তনীয় আর কিছুই নাই। আগে অন্ন, তার পর বস্ত্র, তার পর

সুখভোগ ও আনন্দ। যে কারুর ভূয়োদর্শন হইয়াছে এবং যাহার মনন-শক্তি বিকশিত হইয়াছে, সে কলা-কর্ম জানিয়াছে, সে কলাবান্ হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ দেখিয়া, করিয়া দেখিয়া, ভূয়োদর্শন হয়। ইহার নিমিত্ত তাহার প্রবৃত্তি থাকা চাই, এবং তাহার মনন-শক্তিও থাকা চাই। দর্শনের ও মননের শক্তি কতকটা স্বভাব বা জন্ম হইতে প্রাপ্ত, কিছু শিক্ষার দ্বারা অর্জিত। কতখানি জন্মগত, কতখানি শিক্ষা-সাপেক্ষ, তাহা মাপিবার উপায় নাই। যেমন করিয়া হউক, যাহাদের আছে বা জন্মিয়াছে, তাহারা পরে শিল্পী হইয়া উঠে। শিল্পী সর্বত্র দুর্লভ। কিন্তু ইহারই প্রসাদে কলাবানের কলাবত্তা। কলাবানের শিষ্য কারু। কারুর অধীনে কার্মিকেরা (worker, labour) কাজ করে।

শঙ্করাচার্য বি-দ্যা শব্দের অর্থভেদ বুঝাইয়া দিয়াছেন। বিদ্যা সম্যক্ বাচিক কর্ম। অর্থাৎ বাঙ্ময়ী। এই হেতু মূক ব্যক্তি বিদ্বান হইতে পারে না, কিন্তু স্বচ্ছন্দে কলাবান্ হইতে পারে। বিদ্যা, সমস্তই মুখস্থ বিদ্যা হইতে হইবে, এমন কথা নাই। বিজ্ঞানে ভূয়োদর্শনলব্ধ সূত্র থাকে। যদি ছাত্র স্বয়ং ভূয়োদর্শন না করিয়া অন্যের ভূয়োদর্শনলব্ধ জ্ঞানে তৃপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার স্বয়ং-জ্ঞান জন্মে না। সে বিদ্যা অর্জন করিয়াছে, পরের বাচনিক; কিন্তু বিজ্ঞান পায় নাই। এইরূপ ভূয়োদর্শনের ন্যূনাধিক্যে পঞ্চভূতবিষয়ক জ্ঞান, ভৌতিক বিদ্যা কিংবা ভৌতিক বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। বিদ্যা হউক, বিজ্ঞান হউক, দুই দিক্ হইতে শেখা যাইতে পারে। প্রয়োগ প্রধান লক্ষ্য হইলে তাহা মূর্ত বিজ্ঞান (applied science), আর জ্ঞান প্রধান হইলে অমূর্ত বিজ্ঞান বলা হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, জ্ঞানের যেমন অন্ত নাই, কলারও তেমন নাই, বিদ্যারও নাই। আরও দেখা যাইতেছে, এক দিকে কলা, অন্য দিকে বিদ্যা; মাঝে মূর্ত বিদ্যা বা মূর্ত বিজ্ঞান। বিজ্ঞানশালার মূর্ত বিজ্ঞান কলাশালায় মূর্তিমান হইলে অর্থ আকর্ষণ করে। মূর্ত বিজ্ঞান শিখিলেই অর্থ উপার্জন করিতে পারা যায় না; কারণ, কর্মে অভ্যাস ব্যতীত কোনও কর্ম সফল হয় না। তথাপি দেখা যাইতেছে, বিদ্যা দ্বারা বাচিক কর্মের যোগ্যতা হইতে পারে, যেমন মাষ্টারি ও ওকালতি; অমূর্ত বিজ্ঞান দ্বারা মাষ্টারি ব্যতীত অন্য কোনও কর্মের যোগ্যতা হয় না। আমরা এই বিজ্ঞান শিখিতেছি।

দেশে জ্ঞানপ্রচার।

এখন একবার দেশের শিক্ষার দিকে তাকাই। দেখিতেছি, দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত শিক্ষা চলিতেছে; এবং লোকে শিক্ষিত হইতেছে বলিয়াই বিপুল মানবপরিবারের জীবনপ্রবাহ চলিতেছে। কিন্তু আমরা ইদানী এই শিক্ষা অগ্রাহ্য করিয়া পাঠশালায়, কি বিদ্যালয়ে, কি ইস্কুলে ও কলেজে শিক্ষাই শিক্ষা মনে করিতেছি। আমার বিবেচনায়, এই মস্ত ভুলের দরুণ আমরা এতদিন কিছু করিতে পারি নাই। পাঠশালায় বসিবার, কিংবা বিদ্যালয়ে ঢুকিবার বয়স যাহাদের উত্তীর্ণ হইয়াছে, সে-সব অসংখ্য নর-নারী একেবারে বাদ দিয়া তাহাদের শিশুর দিকে তাকাইয়া আছি। ইহারা 'মানুষ' হইবে, শিক্ষিত হইবে, তার পর দেশ জাগিবে! কিন্তু এ যে বিশ বৎসরের কথা! এই বিশ বৎসর নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিলে পরে কত বিশ বৎসর মৃতবৎ কাটাইতে হইবে, তাহা দেখিতেছি না। মনে করিতেছি, যে কয়েকজন ইংরেজী-শিক্ষিত হইতেছেন, তাহাঁরাই মাথা দিয়া দেশটা ধরিয়া রাখিতে পারিবেন। দেশ দেশ করিয়া বেড়াই, কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় সে দেশ এক-একবার দেখা দিয়া অদৃশ্য হয়। দেশের বুভুক্ষিত দেহের মনের ও আত্মার ভোজ্য কই? লেখা-পড়া-গণা না শিখাইয়াও জ্ঞানের প্রবাহ চালাইতে পারা যায়, যে প্রবাহ গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় প্রসারিত হইয়া বাল-বৃদ্ধ, নর-নারী, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, সকলের দ্বারে দ্বারে অমৃতের কণিকা বিতরণ করিতে পারিত। কৃষি ও শিল্পের 'প্রদর্শনী' নয়, 'নৈশ বিদ্যালয়'ও নয়; চাই জ্ঞানের আলো। একটু আলো দেখাও, একটু কথা কও, একটু হাত ধর; লোকের ধৈর্য আসুক; তাহারা ভাল মন্দ বুঝুক; তাহারা যে মানুষ, এই বোধ জন্মুক।

নিজ-জ্ঞান ও দেশ-জ্ঞান

কিন্তু কিসের জ্ঞান? জ্ঞানের বিষয় দুইটি। আমি ভোক্তা; এবং আমি ছাড়া আর যাহা কিছু আছে, তাহা আমার ভোগ্য। ভোক্তা ও ভোগ্য, জ্ঞানের দুই বিষয়। দুই বটে, কিন্তু ভোগ্য ছাড়িয়া ভোক্তা নাই, ভোক্তা ছাড়িয়া ভোগ্যও নাই। আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাই, আমি কোনও দেশে কোনও কালে বাঁচিয়া থাকিতে চাই। আমি-র জ্ঞান নিজ-জ্ঞান। দেশ-বৃত্তে দেশ-জ্ঞান, এবং ইতিবৃত্তে কাল-জ্ঞান বর্ণিত হয়। এই দুই পরস্পর জড়িত। এই হেতু সংক্ষেপে

এক নাম, 'দেশ-জ্ঞান' বলিতে পারা যায়। দেহ, মন, ও আত্মা, এই তিন লইয়া আমি ভোক্তা। এই তিনেরই জ্ঞান চাই, নতুবা আমার বাঁচা অসম্ভব। এই তিনের জ্ঞান কিছুমাত্র নাই, এমন মানুষ নাই। সকলেরই কিছু কিছু আছে বলিয়া প্রাণধারণ করিতে পারিতেছে। তেমনই, দেশ-জ্ঞান কিছুমাত্র নাই, এমন মানুষ নাই। কিছু কিছু আছে বলিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিতেছে। এই জ্ঞানের সহিত শিক্ষাও কিছু কিছু পাইয়াছে। নিজ-জ্ঞানে জানি, অন্ন বিনা প্রাণরক্ষা হয় না; দেশ-জ্ঞানে জানি, এই দেশে এই কালে অন্ন উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ জ্ঞান, কেবল জ্ঞান। যাহাকে আমরা অকর্মণ্য বলি, সে যে জানে না, এমন নহে; সে করিতে পারে না বলিয়াই অকর্মণ্য।

শিক্ষার ধারা কি হইবে?

আমরা মনে করি, লিখিতে-পড়িতে-গণিতে শেখার নাম জ্ঞানলাভ করা; আর জ্ঞানলাভের নিমিত্ত এই ত্রিকর্ম শেখা চাই। যিনি বলেন, আমাদের দেশের লোকের শিক্ষা নাই, তিনি এই ত্রিকর্মের শিক্ষা মনে করেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। দেশ বিদ্যাহীন, দেশ আধুনিক কলাজ্ঞান-হীন, দেশ পশ্চিমদেশের অর্থকরী শিক্ষা-হীন। আমি বলি, যাহা আছে, তাহা ধরিয়া নাই-র দিকে হাত বাড়াইতে হইবে। নাই-র দিকে একা-এক হাত বাড়াইলে ফলপ্রাপ্তি না হইতে পারে। গাঁয়ে গাঁয়ে পাঠশালা বসাইয়া মনে করুন, দেশের ছেলে-মেয়েকে ত্রিকর্ম শেখাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া গেল। সে বিদ্যা টিঁকিবে কি? টেকে, যদি রসের যোগান্ বরাবর পাইতে থাকে। এই রস এক-রকমের নয়, তাই ত দেশের শিক্ষা ব্যাপার, একা একা তোমার আমার কর্ম নয়। যদি 'রাজা' অর্থে প্রজার বিক্ষিপ্ত ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার আধার হয়, সে রাজাই আবশ্যক রসের যোগান্ দিতে পারেন। ভবের হাট এত বড় যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপার চলিতেছে। মানুষই ব্যাপারী। যাহার যে ব্যাপার, তাহার খোজ লইয়া ঠাঁই করিয়া দেওয়া যেমন-তেমন কর্ম নয়। ব্যাপার অগণ্য; শিক্ষার ধারাও অগণ্য।

আদ্যশিক্ষায় অগণ্য ধারা ধরিতে হয় না; ইহা অল্প সুবিধা নহে। এই শিক্ষা বিনা-বেতনে শিক্ষা, মাতাপিতার ইচ্ছাধীন নয়, অবশ্যক। অতএব রাজাকে মাতাপিতা হইতে হইবে। ইহার রূপ কি

হইবে, সীমা কোথায় টানা যাইবে? সাধারণ মত এই বোধ হয়, বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে ও পড়িতে, এবং সোজা সোজা অঙ্ক কষিতে পারিলেই আদ্যশিক্ষা সমাপ্ত। বোধ হয়, শিশুর নয় দশ বছর বয়সেই এই শিক্ষার ইতি হইবে। আরও কল্পনা করিতেছি, গাঁয়ে গাঁয়ে পাঠশালা বসিবে, হয়ত গাঁয়ে গাঁয়ে বাড়ী তৈয়ার হইবে, এবং পাঁচ ছয় বছরের শিশুকে সেই কারায় চারি পাঁচ ঘণ্টা বসাইয়া লেখা-পড়া-গণা অভ্যাস করাইয়া করাইয়া তাহার শৈশব দুঃখময় করিয়া তোলা হইবে। আমি জানি, বহুর বিবেচনায়, এই ক্রমে লেখা পড়া শিখিয়া দেশে বড় বড় লোকের উদয় হইয়াছে। এই যুক্তি নানা সময়ে নানা স্থানে শুনিয়া থাকি। যখনই কোনও ক্রমের কোনও ব্যবস্থার দোষ দেখাইবে, তখনই বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। এই-সব তার্কিকের চিত্ত কখনও অপ্রসন্ন হয় না; কারণ, ইহাঁরা 'আশঙ্কা' বলিয়া কিছু জানেন না, 'সম্ভাবনা' বলিয়া কিছু জানেন না। ইহাঁরা দেখেন না, যদি এক দুই তিন চারি জনের হিত হইয়াছে, পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ জনের হিত হয় নাই। যদি গুরুমশায়ের ঠেঙ্গা খাইয়া পাটোয়ারী দুই জন হইয়াছে, দশ জন পাটা-চুরি শিখিয়াছে, আর দশ জন যেমন গাধা তেমনই গাধা রহিয়া গিয়াছে। পাঠশালায় ইস্কুলে কলেজেও এমন শিক্ষক দেখিয়াছি, যিনি ছেলেদের সঙ্গে মন খুলিয়া কথা কহিতে পারেন না, হাসিতে পারেন না। এই কঠোর শাসনে তাহাঁরাই অবশ্য অধিক শাস্তি পান এবং বৃত্তির ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিরুৎসাহে অকাল জরায় দিনপাত করেন।

শিক্ষাকাল-বিভাগ

আমি যে শিক্ষার প্রস্তাব করিতেছি, সে শিক্ষা ইহাঁদের দ্বারা চলিবে না। কি রকম শিক্ষক চাই, বিশেষতঃ আদ্যশিক্ষায়, তাহা পরে বলিতেছি। প্রথমে শিক্ষাকাল ভাগ করি। একুশ বৎসর বয়স পর্যন্ত এই কাল ধরা যাইতে পারে। তার পর সংসারধর্ম-পালন আছে। আরম্ভ, পাঁচ উত্তীর্ণ হইলে। অতএব সমগ্র শিক্ষাকাল যোল বৎসর। ইহাকে চারি ভাগে (stages) ভাগ করিলে প্রথম সাত বৎসরে আদ্য-শিক্ষা, দ্বিতীয় তিন বৎসরে মধ্যশিক্ষা, তৃতীয় তিন বৎসরে অন্ত্যশিক্ষা এবং শেষ তিন বৎসরে অধিশিক্ষা,—এই এই নাম দেওয়া যাইতে পারে। অধিশিক্ষা, যেমন বিদ্যা-মহাপীঠে শিক্ষা, সকলের ভাগ্যে ঘটিবে না,

অন্ত্যশিক্ষাও অনেকের ভাগ্যে ঘটিবে না। তথাপি ইহাকেই লক্ষ্য করিতে হইবে। আঠার বৎসর বয়সে এই শিক্ষার শেষ। মধ্যশিক্ষা, পনর বছর বয়সে শেষ হইবে। আদ্য প্রথম চারি বৎসর ও দ্বিতীয় তিন বৎসর লইয়া যে সাত বৎসরের শিক্ষা, সেই শিক্ষা দেশময় ব্যাপ্ত হইতে দেখিতে চাই। চারি বৎসর ছেলেমেয়েকে দুই-চারিখানা বই পড়াইয়া তাড়াইয়া দিলে আদ্যশিক্ষা ব্যর্থ হইবে। আদ্যশিক্ষা অবশ্য শিক্ষা-প্রধান হইবে; মধ্যশিক্ষায় তদুপরি কিঞ্চিৎ বিদ্যার যোগ ঘটিবে। অন্ত্যশিক্ষায় কিছু পূর্ণতা পাইবে। আদ্য-শিক্ষিত বালক ইংরেজী ইস্কুলে যাইতে পারিবে এবং সেখান হইতে ক্রমে ক্রমে বিদ্যা-মহাপীঠে প্রবেশ করিতে পারিবে। বিদ্যা না চাহিলে সে অন্ত্যশিক্ষাশালায় যাইবে এবং লক্ষ্মীর উপাসক হইয়াও সরস্বতীকে সমাদর করিতে শিখিবে। শিক্ষা বহুমুখী চাই, বিদ্যাও বহুমুখী চাই। নতুবা সমাজ-কলের চাকায় চাকায় ঘষা-ঘষিতে শক্তির অপচয় হয়, শিক্ষারও উপযোগিতা হ্রাস পায়।

কেহ মনে করিবেন না, আমি লেখা-পড়া-গণা শেখার নিন্দা করিতেছি। এত বড় একটা কৌশল, যাহার আবিষ্কারে মানুষ এত বড় হইয়াছে, পশুকে দূরে ফেলিয়া আকাশে উড্ডীন হইতেছে, জ্ঞানের বর্তিকায় যুগ-যুগান্তরের অন্ধকার ভেদ করিতেছে, তাহার নিন্দা কে কোথায় করিতে পারে? তবে স্বভাব নাকি ম'লেও যায় না; তাই লেখা-পড়া হাজার শিখিয়াও কৃতবিদ্য ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও এক এক মানুষ দানব হইয়া থাকিতেছে।

আদ্যশিক্ষা। শিশুশিক্ষা।

বক্তব্য একটু বিস্তার করিতেছি। শিশু অল্পে অল্পে দেখিয়া শুনিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া, ভাঙিয়া জুড়িয়া, বিজ্ঞানশালায় বিজ্ঞানার্থী যেমন পরীক্ষা করে তেমন পরীক্ষা করিয়া, দ্রব্যের গুণ আবিষ্কার করে, পুনঃ পুনঃ দেখিয়া ভূয়োদর্শন লাভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে কার্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় করে। পদে পদে ভুল করে, পদে পদে ঠকে। ভুল করুক, কে না ভুল করে? কিন্তু এই ভুলেই যে শিক্ষা হয়, সেই পাকা শিক্ষা। কথা শুনিয়া, বই পড়িয়া সে শিক্ষা অসম্ভব। চারি পাঁচ ছয় বছরের শিশুকে এই শিক্ষা দিতে চাই; তাহাকে লইয়া এখানে-সেখানে বেড়াইতে চাই; সে দেখুক, শুনুক, ভূয়োদর্শন

লাভ করুক। তাহাকে বিজ্ঞানার্থী পরীক্ষক করিতে চাই। তাহার নিকটে নানাবিধ খেলার সামগ্রী রাখিব; সে খেলিবে, সে সবের ক্রিয়া ও গুণ দেখিতে থাকিবে। শিক্ষাশালার গুরুমশায় প্রায় সাক্ষীগোপাল হইয়া থাকিবেন। "প্রায়" বলিতেছি; কারণ, তিনি দৃশ্যতঃ সাক্ষী হইলেও মূলে যন্ত্রী। শিশু তাঁহার যন্ত্রস্বরূপ হইবে।

পাঠশালা ও শিক্ষাশালা।

কেহ কেহ বলিবেন, ইহা আর নূতন কথা কি। আমি নূতন কিছু করিতে বা বলিতে বসি নাই। যিনি শিশুচরিত লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনিই শিশু-শিক্ষাও জানিয়াছেন। দুঃখের কথা এই, যাহা জানা তাহা করা হইতেছে না। বিদ্যাকরী শিক্ষার নিমিত্ত পাঠশালা আছে; জ্ঞানকরী শিক্ষার নিমিত্ত শিক্ষাশালা চাই। ইস্কুল ও কলেজের শিক্ষক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, গ্রামের ছেলেরা যাহারা গ্রামে পালিত হইয়াছে এবং গ্রামে ছুটির সময় কাটায়, তাহাদের ভূয়োদর্শন যত, নগরের ছেলেদের তত নয়। গ্রামের ছেলের উপস্থিত-বুদ্ধি যত, নগরের ছেলের তত নয়। এই প্রভেদের কারণ স্পষ্ট। বিনা যত্নে, বিনা চেষ্টায়, যাহা অজ্ঞাতভাবে ঘটিতেছে, তাহা জ্ঞাতসারে করাইতে হইবে। গ্রামে কৃষি, কলা, ব্যবসায়, বাণিজ্য, পূজা, পার্বণ, যাত্রা, উৎসব যাহা কিছু হইয়া থাকে, শিশুকে সব দেখাইতে হইবে, এবং সুবিধা হইলে তাহাকে দিয়া করাইতে হইবে। গ্রামের পুকুর, নদী, খাল, বিল, মাঠ, বাগান, পথঘাট, গাছপালা, পশুপক্ষী প্রভৃতি তাহার কিছুই অচেনা থাকিবে না। ডাক শুনিয়া পাখীর নাম, গন্ধ শুঁকিয়া ফুলের নাম, চিত্র দেখিয়া তালগাছ কি খেজুরগাছ বলিতে পারিবে। হাটে যাইবে, সুবিধা হইলে সে নিজে কিছু কিছু কিনিবে, কখনও বা কিছু বেচিবে। শোনা গেল, পুকুরে মাছ ধরা হইতেছে, গুরুমশায় ছেলেদিকে লইয়া পুকুর-পাড়ে শিক্ষাশালা করিলেন। অমুকের বাড়ীতে বিবাহ, ছেলে সঙ্গে গুরুমশায় সে বাড়ীতে নিশ্চয় উপস্থিত। এইরূপ, শিক্ষার অগণ্য ক্ষেত্র আছে। বর্তমানকালের শিক্ষা বাড়ীর কুঠরীতে শিক্ষা, সংসার-বিরাগীর শিক্ষা। সেখানে বই-কাগজ-কলম লইয়া শিক্ষা। কদাচিৎ বাগান থাকে; কিন্তু একে ছোট, তাহাও ছেলেদের নয়, যেখানে তাহারা যা ইচ্ছা তা রুইতে বসাইতে পারে। এত কৃত্রিম আয়োজনের মাঝে থাকিয়া শিক্ষা-লোলুপ

শিশুর মন কৃত্রিম পরিখায় ঘুরিয়া বেড়ায়। হায়, সে কিছুই দেখিল না, কিছুই শুনিল না, কিছুই করিল না; কেবল লেখা-পড়া-গণা শিখিল! এই ক্রমে সে বিদ্বান হইতে পারে, কিন্তু কাজের লোক হইতে পারে না।

দেশ-ভ্রমণ ব্যতীত দেশজ্ঞান জন্মে না। শিশুর দেশ, তাহার গ্রাম। নয় বৎসর বয়সে আদ্য প্রথম শিক্ষা শেষ হইবার কথা। চারি বৎসরে যদি শিশু তাহার গ্রামখানির জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারে. আমি মনে করি, যথেষ্ট শিখিয়াছে। তাহার বিকাশোন্মুখ চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্, বাগিন্দ্রিয় ও হস্তপদ স্ব স্ব কর্মে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহার ইচ্ছার আয়ত্ত হইয়াছে এবং যন্ত্রবৎ চালিত হইবার যোগ্য হইয়াছে। চিত্র লিখিতে শিখিয়াছে, ইচ্ছা করিলে গ্রামের রাস্তাগুলি লিখিয়া দিতে পারে। এমন চেঁচাইতে পারে যে, বহু দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। চলিয়া চলিয়া, প্রায়ই শুধু পায়ে, শুধু গায়ে, শুধু মাথায়, তাহার দেহ কষ্টসহ হইয়াছে। গাছে চড়িয়া মনে সাহস জন্মিয়াছে, জলে ঝাঁপাইয়া আনন্দ বুঝিয়াছে। এমন 'দুষ্টু' হইয়াছে যে, মা ছেলের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। একদিন ছেলের মা আসিয়া বলিল,

'বাবা, ঝণ্টকে ইস্কুলে ভর্তি করে' দেও।'

'কেন, কি হয়েছে?'

'ভারি দুষ্টু হয়েছে, একটি কথা শোনে না।'

'এই কারণে জেলখানায় পাঠাবে?'

'এই দুপুর বেলা, কি রোদ! একটু শোবে না, কামরাঙ্গা গাছের তলায় ছুটাছুটি করে, গাছে ঢিল ছোঁড়ে, গাছে চ'ড়্‌তে যায়।'

'বোধ হয় কামরাঙ্গা খাবার ইচ্ছা। ওকে কামরাঙ্গা দিলেই হয়।'

'কামরাঙ্গা খেলে পেট কাম্‌ড়ায়। এখন তাও পাকে নাই।'

'শুধু কামরাঙ্গা খাবার ইচ্ছা নয়, গাছে চড়্‌বারও ইচ্ছা। কামরাঙ্গা গাছে চ'ড়্‌তে পারবে না। পাঁচীরের ধারে যে পেয়ারা গাছ আছে, তাতে চ'ড়্‌তে ব'লো।'

'তা হ'লে আর রক্ষা থাক্‌বে? গাছে দিনরাত ব'সে থাক্‌বে, আর কাঁচা পেয়ারা খাবে।'

'কিছুই ক'র্তে দিবে না? কেমন ক'রে বাঁচ্‌বে, বাড়্‌বে?'

আর একদিন কন্যা আসিয়া বলিল, 'বাবা, ঝণ্টিকে ইস্কুলে না দিলে আর রাখ্‌তে পারা যাবে না।'

'কেন, কি করেছে?'

'দুপর বেলা চৌকীর উপর টুল রেখে তাকের ওষুধের বোতল খুলে ওষুধ ঢেলে সব একাকার করেছে। বিষ ওষুধ খেয়েছে কি না, জানি না।'

'বোতলে কি আছে, দেখাও নাই বুঝি?'

'ওষুধ আর দেখাব কি?'

ইত্যাদি। এই রূপ, দুষ্টু দৌহিত্রের বিরুদ্ধে মাতামহকে বহু অভিযোগ শুনিতে হইত। শিশুকে শিষ্ট শান্ত করিতে করিতে দেশটাই শান্ত হইয়া গিয়াছে! শান্ত ছেলে পণ্ডিত হইতে পারে, কিন্তু "কাজের লোক" হইতে পারে না।

কিন্তু ছেলেরা লেখাপড়া শিখিবে না? নিশ্চয়ই শিখিবে। চারি বৎসর, হারাহারি প্রত্যহ দুই ঘণ্টা শিখিলে যথেষ্ট। সোজা সোজা বই পড়িতে ও বুঝিতে, সোজা সোজা কথা জুড়িয়া বলিতে, স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে ও সোজা সোজা অঙ্ক কষিতে শিখিতে প্রত্যহ দুই ঘণ্টা পর্যাপ্ত। চাণক্য-শ্লোক বোঝে না, কিন্তু শুদ্ধ ও স্পষ্ট করিয়া আওড়াইতে পারিবে; নামতা রচিতে পারে না, কিন্তু অনর্গল বলিয়া যাইতে পারিবে। শিশুকে বিদ্বান্ করিবার প্রয়াসে তাহাকে ভাষা শেখানা হয় না; 'শেখানা' হয়, সাহিত্য; (কেহ কেহ নাম রাখিয়াছেন শিশু-সাহিত্য, যদিও বুড়া শিশু)। তেমনই যে সংখ্যাজ্ঞানে বড় বড় গৃহস্থেরও সংসারযাত্রা নির্বাহ হয়, তাহা না শিখাইয়া মনঃকল্পিত ঘড়ীর কাঁটার দৌড়, লঘিষ্ঠ গরিষ্ঠ গুণনীয়ক প্রভৃতি গরিষ্ঠ কুপথ্য দ্বারা শিশুর মস্তক পূর্ণ করা হয়। উদর পূর্ণ হইলে তাহা প্রবাহিত হইয়া যাইত, কিন্তু মস্তিষ্ক হইতে প্রবাহের পথ নাই।

আচার-ব্যবহার-শিক্ষা।

লেখা-পড়া-গণা অপেক্ষাও প্রয়োজনীয় শিক্ষা আছে। সেটা আচার ও ব্যবহার-শিক্ষা। যে আচার নিত্যাচার নামে খ্যাত, তাহা শিখিতে হয়। তাহা পূর্বজন্মের স্মৃতি (instinct)-বশে বুভুক্ষা ও পিপাসার তুল্য আপনি আসে না। ইহার অপর নাম দিন-চর্যা। ইহা কেবল স্বাস্থ্যরক্ষা বা শরীরপালন নহে; মনের পালন ও দমনও ইহার

লক্ষ্য। দেশাচারও উপেক্ষার বিষয় নহে। বড় হইয়া, জ্ঞানবান্ হইয়া, কেহ দেশাচার কিংবা কুলাচার মানিবে কি ভাঙিবে, তাহার আশঙ্কা লইয়া শিশুশিক্ষা চলিতে পারে না। শৈশবকাল শিক্ষার কাল, ক্রিয়া-অভ্যাসের কাল। কেমন করিয়া চলিতে হয়, দাঁড়াইতে হয়, কাপড় পরিতে হয়, দাঁত মাজিতে হয়, খাইতে বসিতে শুইতে হয়,—এ সবের শিক্ষা বাড়ীর উপর বরাত দিলে চলিবে না। তেমনই, কেমন করিয়া কখন ইষ্টদেবের পূজা করিতে হয়, তাহারও অভ্যাস করাইতে হইবে। বাড়ীর ভরসা নাই বলিয়াই শিশুশিক্ষা এত কঠিন হইয়াছে। আচার সমাজগত; আচারে কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান, কেহ খ্রীষ্টান; কেহ বঙ্গের হিন্দু, কেহ পঞ্জাবের, ইত্যাদি। আচারতত্ত্বে না গিয়া বলা যাইতে পারে, যাহার যে সমাজ (বা ধর্ম), তাহার পক্ষে সে সমাজের (বা ধর্মের) আচার শ্রেষ্ঠ। ব্যবহারও দ্বিবিধ। নিত্য ব্যবহার, অর্থাৎ শিষ্ট ও সাধু ব্যবহার, সকল সমাজের প্রায় এক। কিন্তু দেশ-ব্যবহারও আছে। গুরুজনের নিকটে কি ভাবে দাঁড়াইতে হয়, তাহাঁদের সহিত কি ভাবে কথা কহিতে হয়, কি ভাবে তাহাঁদের পূজা করিতে হয়, ইত্যাদি না শিখাইলে শিশু অবিনীত হইয়া বড় হইবে। শিক্ষার দ্বারা বি-ন-য় অভ্যাস হয়; বেতের ভয় কি জরিমানার ভয়, এমন কি পুরস্কারের উৎকোচ দ্বারা শিক্ষা অর্থাৎ অভ্যাস জন্মিতে পারে না। নিষেধ নহে, বিধি চাই। নিষেধের সঙ্গে বিধি প্রচ্ছন্ন থাকে বটে, কিন্তু এত ঘুরাইয়া, উল্‌টা বুঝাইয়া, বিনয় শিক্ষা শিশুর পক্ষে সহজ হয় না। সকল শিশু একত্র হইয়া এই নয়াভ্যাস করিতে আমোদ বোধ করিবে।

আদ্যশিক্ষক।

শিশু-রূপ উপাদান লইয়া তাহাকে যন্ত্রবৎ করিয়া তোলার নাম শিশু-শিক্ষা। দেশে সে যন্ত্রী কই, তেমন গুরু কই? একজন দুইজন নহে, যত গ্রাম তত গুরু চাই। এ দিকে, আজ্ঞামাত্র গুরু জন্মে না। কিন্তু কোনও বুদ্ধিমান্ বলে কি, যেহেতু দেশে ইট নাই, অতএব শূন্য মাঠে পড়িয়া থাকা কর্তব্য? মাটির কাঁথে খড়ের চালাও হইতে পারে। প্রথম প্রথম কাঁচি ঘরই তুলিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে গুরু-শিক্ষার আয়োজন চলিতে থাকিবে। আদ্যশিক্ষায় যে অফুরন্ত ধৈর্য, অফুরন্ত উৎসাহ, ও শিশুবাৎসল্য চাই, সে তিন গুণ সুলভ নহে। কিন্তু রক্ষা এই, বিদ্বান্ চাই না, 'পণ্ডিত' প্রৌঢ় কিংবা বৃদ্ধ আদৌ চাই না। যুবা

গুরুর অভিজ্ঞতা থাকে না; ছেলেমি থাকিতে পারে, অন্য তিন গুণও থাকিতে পারে। বিশেষতঃ এই গুরুকে শিখাইয়া লইতে পারা যায়; পাকা গুরুকে কাঁচাইতে পারা যায় না। মনে রাখিতে হইবে, পাঠশালা নয়, শিক্ষা-শালা চাহিতেছি। পাঠশালার পণ্ডিত, আর শিক্ষাশালার শিক্ষক এক নহেন। এই রূপ, যে-সব পাঠশালা-নীক্ষক (inspector) আছেন, তাহাঁদেরও কর্তব্য সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিতে হইবে। বিদ্যা অল্প হউক, যাহাঁরা উত্তম শিক্ষক, তাহাঁরাই নীক্ষক পদের যোগ্য।

সর্বাপেক্ষা ভাবনার কথা, আমাদের দেশে শিক্ষা সম্বন্ধে যে সংস্কার আছে, সে সংস্কার এক দিনে পরিবর্তিত হইবে না। দেখা গিয়াছে, 'শিক্ষিত' পিতামাতাও ছেলের পড়া বহির পাতা গণিয়া তাহার শিক্ষার পরিমাণ করেন। পাঠশালা কিংবা বিদ্যালয়ে বিদ্যার পরিমাণ করা হইয়া থাকে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষারও না হয়, তাহা নহে; কিন্তু প্রথম হইতেই শিক্ষাশালার লক্ষ্য স্থির রাখিলে গোলে হরিবোল হইবে না।

মধ্য ও অন্ত্য শিক্ষা

আদ্যশিক্ষার মূল।

কেহ কেহ বলিবেন, শিক্ষার যে আদর্শ ধরিতেছি তাহা উত্তম বটে, কিন্তু কোথায় পাইব। দেশ দরিদ্র; টাকা কোথায়? সে শিক্ষক কোথায়? এমন প্রস্তাব চাই, যাহা দেশের পক্ষে সম্ভব। আমি বলি, প্রথমে মানস (ideal) স্পষ্ট করি, তাহার পর বাস্তব। এক বৎসরে, দশ বৎসরেও এই মানস পূর্ণ হইবে না। ইহার পরিবর্তনও উত্তরোত্তর অনুভূত হইবে। তথাপি বাস্তুকর্ম আরম্ভের পূর্বে যেমন তাহার একটা মানসচিত্র রচিতে হয়, নতুবা পরে তাহার সমুদয় অংশের প্রয়োজনের মিল থাকে না, তেমনই শিক্ষা-সৌধের অঙ্গ-পরম্পরা একত্র না দেখিলে গুরু-লঘু যোগ্য-অযোগ্য বুঝিতে পারা যায় না। এখন দেখিতেছি, শিক্ষাসৌধের পোত শীর্ণ, মাথা ভারী হইয়া পড়িয়াছে, গাছের ডগা হইতে শিকড়ে রস নামিতে হইতেছে। প্রথম প্রথম এইরূপ হওয়া আবশ্যক ছিল। কারণ তখন দেশ-শিক্ষার কথা উঠে নাই; উঠিলেও অসাড় দেশে কথাটা কানে প্রবেশ করিত না। এখন সে দশা গিয়াছে, নিম্ন হইতে উন্নত সোপান রচিবার সময় হইয়াছে।

বর্তমান বিদ্যালয় ইংরেজী ধরণের।

শিক্ষা, বিদ্যা, বিজ্ঞান প্রভৃতি শব্দের অর্থ ধরা হইয়াছে। আরও বিশেষ করিবার নিমিত্ত 'আলয়' ও 'শালা' শব্দদ্বয় একটু পৃথক পৃথক পথে প্রয়োগ করা যাইতেছে। যেখানে কর্ম প্রধান সেখানে 'শালা' এবং যেখানে পাঠ প্রধান সেখানে 'আলয়' শব্দ যোগ করা হইতেছে। প্রচলিত নামের মধ্যে 'পাঠশালা' নামটিতেও এই ভাব প্রচ্ছন্ন আছে। পূর্বকালের গ্রামের পাঠশালায় পঠন অল্প হইত, শিক্ষা—কর্মে অভ্যাস—অধিক হইত। প্রথমে লেখা, পরে পড়া। ইহাই ঠিক কর্ম। এখন প্রথমে বই ধরে, পরে লেখা শেখে। যে-সব 'বিদ্যালয়' হইয়াছে, 'বঙ্গ বিদ্যালয়' হউক, 'ইংরেজী বিদ্যালয়' হউক, —সে-সবে পাঠশালার ক্রিয়াভ্যাস হ্রাস পাইয়াছে। বিদ্যালয়ে ১০টা হইতে ৪টা পঠনাদি হয়। রবিবারে রবিবারে বিশ্রাম হয়। সেখানে বেঞ্চি চেয়ার টেবিল অনেক, এবং সাধারণতঃ 'শিক্ষক' বলিলেও বুঝি বঙ্গ বিদ্যালয়ে 'পণ্ডিত', এবং ইংরেজী বিদ্যালয়ে 'মাষ্টার' 'লেকচারার' 'প্রোফেসর' প্রভৃতি বিদ্যা অর্পণ করেন। অর্থাৎ 'আলয়'গুলিতে ইংরেজী ধরণ স্পষ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শিক্ষাশালা দেশীয় হইবে।

ইংরেজী ধরণের সবই মন্দ, তা বলি না। কিন্তু দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া দেশীয় ধরণ যত রাখিতে পারা যায়, তত ভাল মনে করি। দেশীয় ভাব আমাদের সাত্ম্য হইয়া গিয়াছে; ইহাকে হঠাৎ পরিবর্তন করিলে দেশের প্রাণরক্ষা বিপদসঙ্কুল হইয়া পড়িবে। পশ্চিমদেশের উত্তম জ্ঞান চাই; কিন্তু ইহার অর্থ এমন নহে যে, পশ্চিমদেশীয় পাত্রে সে জ্ঞান-বারি পান না করিলে ফল পাওয়া যাইবে না। দুই দিক দিয়া এই মন্তব্য বুঝিতে হইবে,—(১) আন্তর, (২) বাহ্য। দেশ হইতে যে বিদ্যা, বিজ্ঞান, বা শিক্ষা লাভ হয়, সেটি দেশীয়। এটি সহজে সাত্ম্য হয়। আমরা বলি, বালক-বালিকারা চারি পাশে যাহা দেখে, তাহা ধরিয়া জ্ঞানবৃদ্ধি করা প্রশস্ত। কাজে কিন্তু প্রায়ই বিপরীত দেখি। বহির লেখা দেখিয়া দেশে দৃষ্টান্ত খুঁজি! ক্রিয়াটা আন্তর হইতে বাহ্যে চলিয়া যায়। নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তক হইতে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দিতে পারা যায়। পুস্তক-লেখক নিজে যে ভাবে শিখিয়াছেন, হাজার সতর্ক হইলেও তাহার কৃত

পুস্তকেও সে ভাব চলিয়া আসে। এমন 'ভূগোলবিবরণ' দেখি নাই যাহার আরম্ভে ভূ যে গোলাকার, তাহার চতুর্বিধ প্রমাণ লিখিত হয় নাই; এমন 'পাটীগণিত' দেখি নাই যাহার আরম্ভে 'সংখ্যা' ও 'একক' ও 'গণিত' সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করা হয় নাই। (তবে, 'পাটী' কেন বলে তাহার ব্যাখ্যা দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইতেছে না। বোধ হয়, ইংরেজী arithmetic শব্দের মধ্যে 'পাটী' আবিষ্কৃত হয় নাই।) সে যাহা হউক, বিদ্যালয়ে যাহা চলুক, শিক্ষাশালায় এই বিধি একেবারে অসংগত হইবে। ইতিহাসে ও বিজ্ঞানে, কলা ও বার্তায়, সকল বিষয়ে ভোক্তা বা 'আমি'র প্রয়োজন প্রধান লক্ষ্য হইবে। যে বিদ্যায়, যে জ্ঞানে 'আমার' প্রত্যক্ষ প্রয়োজন নাই, তাহা শিক্ষাশালায় বর্জন করিতে হইবে।

সবাই জানি, ইংরেজী পাঠের এমন গুণ যে, ছেলেমেয়েরা 'বাবু' হইয়া পড়ে। ছেলেকে জুতা চাই, জামা চাই, ছাতা চাই; মেয়েকেও কিছু কিছু মেম সাজিতে হয়। কেন হয়, কে জানে। কিন্তু শৈশব হইতে নূতন পরিচ্ছদে সাজিতে সাজিতে অভ্যাস বদ্ধমূল হইয়া যায়, এবং যৌবনের চাপল্যের সহিত যুক্ত হইয়া দেশের সমক্ষে উপহাস মনে হয়। এখন দেখি, বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার অর্থ অট্টালিকা-নির্মাণ, চেয়ার-বেঞ্চি-টুল প্রভৃতি পশ্চিমদেশের নানাবিধ গৃহোপকরণের সমাবেশ। এমন ক্ষেত্রে পালিত হইলে কোন্ ছেলে তাহার অনুরক্ত না হইয়া পড়িবে? আমাদের দেশের পক্ষে, বিদ্যামন্দিরের এই আদর্শ, বিদ্যা-সেবকের সভ্য আদর্শ, সম্পূর্ণ নূতন। আমরা বাড়ীতে জামা গায়ে জুতা পায়ে টেবিলের ধারে চেয়ার বা বেঞ্চিতে বসি না, আমাদের সুধা-ধবলিত অট্টালিকাও নাই। সরস্বতীর মন্দিরে লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য স্পৃহণীয় কি না, তাহাও বলিতে পারা যায় না। কিন্তু ইহা ঠিক, ধনশালী জাতি আমাদের শিক্ষাবিধাতা না হইলে আমরা হয়ত দো-চালায় তুষ্ট হইতাম, এবং অট্টালিকা-নির্মাণের পয়সা দিয়া ছাত্র পালন করিতাম। কিশোর ও যুবার পক্ষে কঠোর ব্রহ্মচর্য ও কৃচ্ছ্র-সাধন, দেশের হিতজনক হইত। গোবর-নিকানা ঘরে যাহাকে বাস করিতে হইবে, গামছা কাঁধে ধুতি পরিয়া যাহার দিন কাটিবে, তাহার পক্ষে এই নূতন আদর্শ সমুদয় শিক্ষাকে কৃত্রিম করিয়া ফেলিতেছে। শিক্ষা দীক্ষা যেন বাহিরের কিছু; নিত্য-নৈমিত্তিকের কিছু নহে। পোষাক পরিয়া আফিসে যাই; বাড়ীতে পোষাক খুলিয়া স্বস্তি বোধ

করি। কারণ আফিসটা আমাদের নয়। গ্রামে জমীদারী কাছারিতে, কিংবা গ্রামের 'ডাকে' (সভায়), সভ্য হইয়া যাইতে হয়, এক-ছোটে যাইবার জো নাই; কিন্তু দো-ছোট-টি নূতন নহে, হয় গামছা নয় চাদর। অথচ সেসব সভার গাম্ভীর্যের ও সম্মানের কিছুমাত্র হানি হয় না। শিক্ষাশালায় কেহ আসিয়া তামুক খাইয়া গেল; যাউক না, কোনও ক্ষতি নাই। কারণ গ্রামে তামুক এত চলিত যে, তাহা নূতন দেখা হইবে না। কিন্তু জামা গায়ে গিয়া বসাই নূতন। তা ছাড়া, ছেলে-বেলা হইতে গায়ে রোদ জল বাতাস, চোখে আলো লাগাইয়া, দেহ দৃঢ় না করিলে বাঙ্গালী জাতি কোমলাঙ্গ হইয়া পড়িবে, কষ্টকর অর্থকরী কর্মের যোগ্য হইবে না। মধ্যাহ্নে বিশ্রাম; সকালে কিম্বা বিকালে শিক্ষাশালা খুলিলে জাতিটা অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ রোগ হইতে রক্ষা পাইবে।

আদ্য দ্বিতীয় শিক্ষাকালে বালকবালিকা শিক্ষাশালায় সকালটা দিতে পারিবে না। মায়ের সঙ্গে মেয়ে ঘরকন্নার কাজ করে,—ইহাই ত শিক্ষা; বাপের সঙ্গে ছেলে চাষে খাটে, কলাকর্ম করে, কিম্বা দোকান-পাট দেখে—শিক্ষাই ত পায়। শিক্ষাশালার অর্ধেক শিক্ষা বাড়ীতে পায়; কাজেই ছেলে মেয়ে দুই বেলাই শিক্ষা পায়।

ব্যায়াম-অভ্যাস

শিক্ষার দ্বারা মানসিক বৃত্তির পূরণ হইতে পারে কি না, কে জানে। তথাপি এমন শিক্ষা বাঙ্গালীর চাই যাহাতে বুদ্ধির সহিত ক্রিয়ার যোগ ঘটে, অভিমান ও নির্ভীকতা দ্বারা সত্যবাদিতা ও সত্য-কারিতা দৃঢ় হয়, দেহের বল ও শ্রমশীলতা বাড়িতে পারে।

দেহের বল-বৃদ্ধি ও জড়তা-হ্রাস আশু কর্তব্য হইয়াছে। বাঙ্গালীর অন্নের কিছু পরিবর্তন আবশ্যক। শৈশবের ব্যায়াম, খেলা ও ছুটাছুটি, লাফালাফি ও অন্যান্য দুরন্তপনা। কিন্তু নয় বর্ষ বয়সের পর হইতে একটু একটু ব্যায়াম আরম্ভ করিয়া যৌবনে তাহা পূর্ণভাবে করিতে হইবে। বিনা উপকরণে ব্যায়াম সর্বত্র সুলভ। মোটের উপর এই ব্যায়ামই ভাল। বলা বাহুল্য, হাঁটা-হাঁটি, দৌড়া-দৌড়ি, কিংবা খেলার একঘেয়ে অঙ্গ-কুঞ্চন ও প্রসারণ ব্যায়াম নহে। খেলার প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে প্রয়োজন ও ব্যায়ামের প্রয়োজন এক নহে। রণাভ্যাস (drill) উত্তম; কিন্তু দেহের বল ও পুষ্টি, অঙ্গের

নমনীয়তা ও দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে আনুক্রমিক ব্যায়াম আবশ্যক। কেবল ব্যায়াম নহে; আত্মরক্ষার উপযোগী লাঠিখেলা ও তরবার-চালনা, বাঁটুল-ছোঁড়া শিক্ষাও চাই।

উদ্‌ভাবনা-শিক্ষা

শিক্ষার দ্বারা উদ্ভাবনা বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। চিত্রলিখন ও শয়শিক্ষা (শয়=হস্ত; manual training) ইহার আদি। চিত্র-লিখন দ্বারা উপকল্পনা আকৃতি প্রাপ্ত হয়, শয়শিক্ষা দ্বারা তাহার জড়মূর্তি করিতে পারা যায়। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের বহু শিক্ষক চিত্রশিক্ষা ও শয়শিক্ষার প্রতি প্রসন্ন নহেন। তাঁহারা মনে করেন, সময়ের অপব্যয়। সে সময়ে দুইটা অঙ্ক কষিলে, কিংবা দুই পাত পড়িলে ছেলের উপকার হইত। মনে আছে যখন বঙ্গ বিদ্যালয়ে শয়শিক্ষা প্রথম প্রবর্তিত হয়, তখন অনেক গণ্যমান্য দেশহিতৈষী ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ছেলে কি ধুচনী বুনিতে শিখিবে? আমি বলি, শুধু ধুচনী নহে, তালপাতা বা খেজুরপাতার চাটাই বুনিবে, বাখারী দিয়া খেলা-ঘর গড়িবে, কাগজের ঘুড়ী করিয়া উড়াইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি যথাসাধ্য সবই করিবে। আদ্য শিক্ষাকালে যে শয়শিক্ষা আরম্ভ হইবে, তাহা বাড়িয়া বাড়িয়া ক্রমে অভিপ্রায়-কল্পনা (designing) ও মূর্তিনির্মাণে (modelling) দাঁড়াইবে। প্রথম প্রথম অনুকরণ চাই; মন ও চোখ ও হাতের একটু সহযোগিতা অভ্যাস হইলে আর অনুকরণ থাকিবে না, নির্মাণ চলিতে থাকিবে। চতুর শিক্ষক জানেন, অনুকরণের সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণ অভ্যাস হইতে পারে। আর, নির্মাণে যে ছেলের রতি জন্মিয়াছে, সে কাজের লোকও হইয়াছে। অভিরতি ও অভিনিবেশ দুই ভাই, যেন রাম ও লক্ষ্মণ। তখন চৌদ্দবৎসর বনবাস কিছু নয়, আর গাছ পাথর দিয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধনও কিছু নয়। তর্জন করিলে, বেত দেখাইলে অভিনিবেশ অবিলম্বে অন্তর্হিত হয়; অভিরতি জন্মিলে অভিনিবেশ আপনি আসে, আর নির্মাতা হইতে দিলে অভিরতিও চলিয়া আসে। যাহার অভিনিবেশ জন্মিয়াছে, তাহার শিক্ষার পথও খুলিয়া গিয়াছে। দুঃখ হয় আমরা ছেলেগুলাকে বাঁধিয়া পিষিয়া মারিতেছি। বড় হইলে বলি, 'তাইত, ইস্কুল কলেজ এতকাল খোলা হইয়াছে, দেশে উদ্‌ভাবনার চিহ্ন দেখা গেল না।' আমি বলি, অনেক কাল দোড়ী বাঁধিয়া রাখা

গিয়াছে; এখন দোড়ী কাটিয়া একটু ছাড়িয়া দিয়া দেখা হউক না। দোড়ীর গুণ নাই এমন নহে; অনুকরণও শিক্ষার সহায়। তথাপি দৌড়াইতেও দেওয়া চাই। কোন্ দিকে কতদূর দেওয়া ভাল, দুঃখের বিষয়, তাহার লেখাপড়া করিতে পারা যায় না।

নীক্ষক ও পাঠ্য পুস্তক।

যদি বা শিক্ষক পাই, তাহাঁর নীক্ষকের (Inspector) উৎসাহ পাই না; নীক্ষকই বা কি করিবেন, তাহাঁকে শিক্ষাধিকারের (Education Department) ঘর পূরণ করিতেই হইবে। ইহাও সত্য, ঘরপূরণ ব্যাপার না থাকিলে হয়ত অনেক শিক্ষক ও নীক্ষক নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িতেন। কারণ, দেশের লোক শিক্ষা-বিষয়ে প্রায়ই উদাসীন, কিংবা কল্পনা-হীন। তথাপি মনে হয়, ইস্কুলের (ও কলেজের) ঘর মাপা ও বেঁঞ্চ গঠা কিংবা শিক্ষকের ও কর্তৃপক্ষের দোষ ধরা কম হইলে শিক্ষার তেজ মন্দা হইত না। যে সময় নীক্ষক মহাশয় বালক-বালিকার বিদ্যা পরীক্ষা করেন, সে সময় তাহাদিগকে পড়াইয়া দেখাইলে শিক্ষকের দোষ সহজে সংশোধিত হইত। বঙ্গবিদ্যালয় ও ইংরেজী ইস্কুলে যে যে পুস্তক পাঠ্য ধার্য হয়, এবং বালক-বালিকার অভিরক্ষিতার নিকট অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়, নীক্ষক মহাশয় স্বয়ং পড়াইয়া দেখাইয়া লোকের বিরুদ্ধ সমালোচনা অনায়াসে খণ্ডন করিতে পারিতেন। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে দোষ ঘটে না, এমন নহে। সে দোষ নিবারণের এই উপায় আছে। অন্য উত্তম উপায়ও আছে। পাঠগ্রন্থলেখককে ইস্কুলে লইয়া গিয়া পড়াইতে বলা। এই বিধি হইলে কাণ্ডজ্ঞানহীন লেখক সাবধান হইতেন, অন্যকে দিয়া তাহাঁর বই লেখানা বন্ধ হইত, এবং শিক্ষাধিকারও অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন।

মানুষের চারি বর্ণ।

বালকবালিকাদিগকে চারি ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। বক্তব্য-লাঘব-নিমিত্ত, 'ভাগ' না বলিয়া 'বর্ণ' বলি। কেহ ব্রাহ্মণ বর্ণ, কেহ ক্ষত্রিয় বর্ণ, কেহ বৈশ্যবর্ণ, কেহ শূদ্রবর্ণ। মিশ্রবর্ণ অনেক আছে, কিন্তু পঞ্চম বর্ণ নাই। আদ্যশিক্ষাকালে বালকের গুণাগুণ প্রকাশ হইতে থাকে। কোন্ বালক কোন্ বর্ণের তাহা বিচক্ষণ পিতা বিশেষতঃ শিক্ষক অনায়াসে বুঝিতে পারেন। বর্তমান শিক্ষানীতির দোষ এই,

স্বাভাবিক বর্ণভেদ অস্বীকার করিয়া দেশের যাবতীয় বালককে ব্রাহ্মণ বর্ণের মনে করিয়া এক বিদ্যালয়ের এক বাঁধা পথে চালিত করিতেছে। এক বর্ণ লইয়া কোনও দেশ চলিতে পারে না; কোনও দেশে সকল বালক এক বর্ণেরও হইতে পারে না। দুঃখের কথা, দেশে ক্ষত্রিয় বর্ণের উপজীবিকা নাই। তাই কেহ ডাকাত হইতেছে, কেহ বা গ্রামে ও নগরে দুর্দান্ত পশুর ন্যায় বিচরণ করিতেছে। অন্য দিকে কেহ প্রকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বর্ণের হইলেও দাস্যবৃত্তি গ্রহণ করিতেছে। যে শূদ্রবর্ণের, সে দাসত্ব করিলে তাহার পক্ষে ভাল, দেশের পক্ষেও ভাল। বৈশ্যবর্ণের শিক্ষা দেশে যাহা ছিল, তাহাই চলিতেছে। এই বর্ণের শিক্ষাই, অর্থকরী শিক্ষা। এই শিক্ষার অর্থ এরূপ নহে যে, বিদ্যার সহিত সম্পর্ক থাকিবে না। আমার বিশ্বাস, অর্থকরী শিক্ষা হইতে বিদ্যা বিসর্জন করাতেই দেশের নূতন নূতন কারুশিক্ষা-শালায় (Industrial School) শিক্ষার্থী জোটে না। বিদ্বান্ চাই; জাতিধর্ম-নির্বিশেষে বিদ্বান্ উৎপাদন করিতেই হইবে। বিদ্যার গ্লানি, ধর্মের গ্লানির তুল্য, দেশের মৃত্যুর লক্ষণ। বিদ্যাকে প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া বিদ্যাকরী শিক্ষা, এবং বার্তা বা কলা বা বাণিজ্য, এমন কি প্রজাসেবা রাজসেবা প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া অর্থকরী শিক্ষা।

গুরুর শিষ্যত্ব।

পূর্বকালে ছিল, গুরুর শিষ্য না হইলে বিদ্যা হইত না। একালে সে সত্য খণ্ডিত হয় নাই, শিষ্যত্ব স্বীকার ব্যতীত কর্মজ্ঞান জন্মে না। বিদ্যালয়ে বিদ্যালাভ হইতে পারে; কিন্তু গুরু ব্যতীত শিক্ষিত হইবার উপায় নাই। অর্থকরী শিক্ষায় গুরু অবশ্য চাই। কাজ যত তুচ্ছ মনে হউক, শিষ্য হইতেই হইবে। কলা-বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়া আসিলেই কলা-প্রতিষ্ঠার সামর্থ্য জন্মে না। ইয়ুরোপ ও আমেরিকা দেশে কলাতে দীক্ষিত করিবার বহু আয়োজন আছে, বিদ্যালয়ের যুবকদের অজানা কিছু থাকে না। তথাপি কোনও কলাস্বামী কলাবিদ্যালয়-সমাবৃত্ত যুবককে নিজের স্থানে বসাইতে সাহসী হয় না। কর্ম না করিলে কর্মশিক্ষা হয় না। সে শিক্ষা বিজ্ঞান-শালায় হয় না, কলা-শিক্ষাশালায় হয় না। বাণিজ্য সম্বন্ধেও এই কথা। কলেজে বাণিজ্য-বিদ্যা শিখিয়া বণিক্ হইতে পারা যায় না। ইহাও মনে রাখা কর্তব্য, বিদ্যাকরী শিক্ষায় গুরু পাওয়া যত সোজা,

অর্থকরী শিক্ষায় তত সোজা নহে। কারণ, বিদ্যা "যতই করিবে দান তত যায় বেড়ে"; আর কলা ও বাণিজ্য-জ্ঞান, "যতই করিবে দান তত যায় কমে।" কৃষিবার্তায় এরূপ নহে; আমার ভূমিতে দশ মণ জন্মিলে তোমার ভূমির উৎপন্ন কম হয় না। এই যে শিষ্যত্ব বলিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ শিষ্যত্ব, নীচের ধাপ হইতে শিষ্যত্ব—যে ধাপে কুলী মজুর কাজ করে। বিদ্যার গরিমা মাথায় থাকিলে এইরূপ শিষ্যত্ব স্বীকার সহজ হইবে না। এই কারণে প্রস্তাবিত শিক্ষাশালায় বাল্যকাল হইতেই বালককে কুলীর কর্ম করাইতে হইবে।

বর্তমান ইংরেজী-শিক্ষিতের দশা।

বিদ্যামহাপীঠের সমাবৃত্ত যুবকদের সাফল্যের আশা অল্প। ইহার প্রধান কারণ, যে যত পড়িয়াছে সে নিজেকে তত ভুলিয়াছে, যে যত পড়ে সে তত অজ্ঞ হয়। তাহার মস্তিষ্কের কুঠরীগুলি পরের বিদ্যায় এমন পরিপূর্ণ থাকে যে চিন্তার স্থান থাকে না। তাহার সর্জনা ও উদ্ভাবনা লুপ্ত হয়, সে কলের পুতুল হইয়া যাহা পড়িয়াছে তাহা আওড়ায়। পঞ্চতন্ত্রে যে পণ্ডিত-মূর্খের উপাখ্যান আছে, তাহা মিথ্যা নয়। তর্ক ও বিতর্কের আবর্তে পড়িয়া জ্ঞানের নৌকা ডুবিয়া যায়। কর্ণধারের ভূয়োদর্শন ও স্বয়ং-জ্ঞান অর্থকরী নৌকাকে রক্ষা করে। এই কারণে বলি, যদি বিদ্বান্ হইতে না চান, যদি বিদ্যামহা-পীঠের উচ্চ সোপানে উঠিবার সামর্থ্য না থাকে, যদি অর্থই কাম্য হয়, তাহা হইলে বি-এ এম্-এ পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া কালব্যয় ও অর্থব্যয় করিবেন না। ব্যবসায়ীর (ব্যবসায়=industry) শিষ্যত্বে সে সময় সে অর্থ প্রয়োগ করুন। বেতন দিতে হইলে বেতন দিয়া,—লইয়া নহে, সরকার হউন। বি-এ এম-এ হইতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখিত হইবেন না। উপাধির মোহ দুই দিনে কাটিয়া যায়; কিন্তু অধিকাংশের পক্ষে প্রাণরক্ষার উপায় অন্বেষণ স্বাভাবিক। প্রাণরক্ষার পর ধনসঞ্চয়ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সমুদয় পৃথিবী পড়িয়া আছে, আপনার স্থান আপনাকেই করিয়া লইতে হইবে। ইহাও সত্য, তারা অগণ্য, চন্দ্র একটি। কিন্তু তারা হইয়াও মানব-জমীন্ আবাদে বাধা নাই। এই আবাদ ছাড়িলেই তারা নিবিয়া যায়, চন্দ্রেরও শশ-লাঞ্ছন বিকট আকার ধারণ করে।

বিজ্ঞান-মহাপীঠ চাই।

কলিকাতা বিদ্যামহাপীঠে প্রবেশ না করিয়াও দেশ-পূজ্য প্রাতঃস্মরণীয় লোকের আবির্ভাব হইয়াছে। অবশ্য ইহাঁরা ক্ষণজন্মা পুরুষ। ইহার বিপরীত শত শত দৃষ্টান্ত আছে। তবে দুঃখ হয়, যখনই নূতন বিদ্যামহাপীঠ স্থাপিত হইতেছে তখনই কলিকাতা বিদ্যা-মহাপীঠের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতেছে। আদিপীঠ ব্যর্থ হয় নাই: এই পীঠ অবশ্য রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু তা বলিয়া নূতন উদ্দেশ্য ও সমাজের প্রয়োজন -সাধনোপযোগী অন্য মহাপীঠ স্থাপনে ক্ষতি কি? মূর্ত বিজ্ঞান শিখাইবার নিমিত্ত মহাপীঠ চাই। ঢাকায় যে নূতন বিদ্যামহাপীঠ হইবে, তাহাকে মূর্তবিজ্ঞান-মহাপীঠ করিলে দেশের একটা বড় অভাব দূর হইত। দেশে টাকা নাই; তাহাতে একই উদ্দেশ্যে একেরই বহু টাকার টনাটানিতে কোনটাই প্রসারিত হইতে পারিবে না। কেহ কেহ বলেন, কলিকাতা বিদ্যামহাপীঠে এত কার্যবাহুল্য ঘটিয়াছে যে, বেড়া দিয়া ছোট করিয়া ফেলা আবশ্যক। এই তর্ক ঠিক হইলে এত বড় ভারতবর্ষে এক বড়লাটের শাসন সুন্দরভাবে চলিতে পারিত না। আসল কথা, আমরা নিজের স্বার্থ বুঝিতে পারি না, ঈর্ষানলে পুড়িতে জানি। সে যাহা হউক, অর্থকরী শিক্ষার এক উচ্চাঙ্গে মূর্ত বিজ্ঞান আছে; তাহা অধিশিক্ষার আধার। যদি অন্ত্য শিক্ষার আয়োজন হয়, তাহা হইলে অধিশিক্ষারও হইবে।

গুরুকুল।

আদ্য শিক্ষার সময় ছেলে-মেয়েরা অবশ্য বাড়ীতে থাকিবে। মেয়েদের মধ্যশিক্ষার কাল তাহাদের বাড়ীতে না হইলে চলিবে না। কিন্তু ছেলেদের পক্ষে গুরুগৃহ ভাল। এইরূপ অন্ত্যশিক্ষা ও অধিশিক্ষার সময় গুরুগৃহ আরও ভাল। এই এই কালে গুরু-গৃহে না থাকিলে ছাত্রেরা শিক্ষার সময় কুলাইয়া উঠিতে পারিবে না, হয় শিক্ষার নয় স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘটিবে। গুরুগৃহ কিংবা গুরুকুল নামে ডরাইবেন না, কিংবা প্রাচীনকালের গুরুকুলও মানসনেত্রে দেখিবেন না। এখন ইস্কুল-কলেজের সঙ্গে boarding house, hostel, mess আছে। এ-সব গুরুকুল বই আর কি, যদিও কুলপতি (superintendent) গুরু না হইয়া প্রায়ই রক্ষী মাত্র। গুরু ও শিক্ষকের মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। গুরুর আসন বহু উচ্চে, যেখানে

মাতা-পিতার আসন। শিক্ষকের আসন নিম্নে। শিষ্যকে গুরু মানুষ করিয়া দিবেন, ছাত্রকে শিক্ষক অভীপ্সিত বৃত্তিলাভের যোগ্য করিয়া তুলিবেন। গুরু পিতৃস্থানীয়, শিক্ষক মিত্রস্থানীয়। এই গুরুর অগাধ পাণ্ডিত্য থাকিতে হইবে, এমন নহে। কিন্তু তাহাঁর দয়া ও দাক্ষিণ্য, সত্যতা ও ত্যাগিতা দ্বারা শিষ্যের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে, এবং তাহাঁর চরণে শিষ্যের মস্তক ভক্তিভরে নত হইবে। গুরুকে ধর্মপিতা বলিলে চলে। ইহাঁর স্থান যে সে লইতে পারেন না।

শিক্ষার ব্যয়-নির্বাহ।

এই গুরু কোথায় পাওয়া যাইবে, এত শিক্ষক কোথায় পাওয়া যাইবে; শিক্ষার ব্যয়, গুরুকুলের ব্যয় কে যোগাইবে? প্রশ্নে নৈরাশ্য আছে; কিন্তু উত্তর স্পষ্ট,—যাহার মাথাব্যথা তাহাকেই বৈদ্য খুঁজিতে হইবে, ঔষধ ও পথ্য তাহাকেই সংগ্রহ করিতে হইবে। আমার মাথা-ব্যথায় তোমার বেদনা হইবে না। যদি শিক্ষাই একান্ত আবশ্যক মনে কর, অন্য ব্যয়-সঙ্কোচ করিয়া অন্ততঃ বছর কতক চোখ-কান বুজাইয়া শিক্ষাকল চালাইয়া দেও। কারণ কথাটা অপ্রিয় হইলেও, 'না' হইতে কদাচ কুত্রাপি 'হাঁ' হয় নাই।

কাশিমবাজারের মহারাজার বিশ্বকর্মশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পেটাবেল সাহেব টাকার একটা উপায় দেখাইয়াছেন। আমি তাহা অনুমোদন করি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে উপায় দেশশিক্ষার আদ্যন্ত চলিবে না, স্থানবিশেষে বৃত্তিশিক্ষাবিশেষে উত্তম চলিতে পারে। তাহাঁর প্রস্তাবে ছাত্রেরা শিক্ষার ব্যয় নিজে নিজে উপার্জন করিবে। ছাত্রেরা নিজের হাতে চাষ করিবে, অন্নের যোগাড় হইবে; নিজের হাতে কাপড় বুনিবে, বস্ত্রের যোগাড় হইবে। কিংবা অন্য কিছু উৎপাদন করিয়া তাহার মূল্যে খাওয়া-পরা চালাইবে। কিন্তু দেশটা এতই দরিদ্র যে ইহাদের উৎপন্ন না পাইলে মাতাপিতা, ভাই-বইন খাইতে পান না। পূর্বেই বলিয়াছি, দেশময় শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে ছাত্রদিগকে প্রত্যহ ৬ ঘণ্টা বিদ্যালয়ে বা শিক্ষাশালায় ধরিয়া রাখা চলিবে না। তাহাদিগকে এক বেলা, বিকাল বেলা পাওয়া যাইবে। সারাদিন পরিশ্রমের পর রাত্রে ধরিয়া রাখায় নিষ্ঠুরতা হইবে, ছাত্রদিগের আয়ু ও আরোগ্য নষ্ট হইবে। অতএব যে-সব ছাত্রকে মাতাপিতার সংসারে সাহায্য করিতে হয় না, কেবল তাহারা পেটাবেল সাহেবের কল্পিত শিক্ষার ব্যয় কিয়দংশ

যোগাইতে পারিবে। কিন্তু এরূপ ছাত্র হাজারে পাঁচজন পাওয়া যাইবে কিনা, সন্দেহ। যে দেশ দারিদ্র্যের পঙ্কে নিমগ্ন, তাহার উঠিবার শক্তি ও উপায় -আবিষ্কার আদৌ সোজা নহে। আদ্যশিক্ষাকালে বালক-বালিকারা তেমন কিছু উপার্জন করে না; কারণ তখন তাহাদের শক্তি থাকে না।

শিক্ষক।

শিক্ষকশিক্ষাও অল্পব্যয়সাধ্য হইবে না। এই শিক্ষক দুই প্রকার চাই; গ্রামে গ্রামে জ্ঞানপ্রচার-নিমিত্ত প্রদর্শক এবং শিক্ষাশালায় শিক্ষক। বরং শিক্ষকের কর্ম সহজ, প্রদর্শকের কর্ম গুরুতর। গ্রামে গ্রামে হাটে হাটে নিজ-জ্ঞান ও দেশ-জ্ঞান বিলাইতে হইবে, লোকে গ্রহণ করুক আর নাই করুক। যাহাঁর আচারে ও ব্যবহারে সংযম অভ্যাস হইয়াছে, অথচ যিনি স্বদেশ-অভিমানী, এইরূপ লোককে কার্য (duties) শিখাইয়া দিয়া প্রদর্শক করিতে হইবে। এ বিষয় দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তার করা যাইবে। প্রদর্শক দুই প্রকার; কেহ অটমান (itinerant), গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে বাক্য দ্বারা, গীত দ্বারা, দ্রব্যপ্রদর্শন দ্বারা, চিত্র দ্বারা, যে জ্ঞান যাহাতে সুবিধা তাহাতে উপস্থিত করিবেন। কেহ দেশের হৃদয়স্থ হইয়া সাপ্তাহিক পত্র পাঠাইয়া গ্রামে গ্রামে জীবন-রস সঞ্চারিত করিতে থাকিবেন। এই-সকল প্রদর্শক ও গ্রামের ও নগরের শিক্ষকদিগের মধ্যে নাড়ীর যোগ রাখিতে হইবে। নতুবা একদিকে প্রদর্শকের কর্মে বিঘ্ন হইবে, অন্যদিকে রসের অভাবে শিক্ষকের জীবন শুখাইতে থাকিবে। শিক্ষকদিগের মধ্য হইতেই নীক্ষক নির্বাচিত হইবেন; কিন্তু নীক্ষক চিরদিন নীক্ষক থাকিবেন না, তাহাঁকে মাপ--জোখের কলে পরিণত হইতে দেওয়া হইবে না। কর্মের পরিবর্তন চাই; শিক্ষক কখনও নীক্ষক, নীক্ষক কখনও শিক্ষক, কদাচিৎ প্রদর্শক, কখনও গুরুকুলপতি হইবেন। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যায়াম যেমন দেহের স্বাস্থ্যের অনুকূল, চিত্তের বি-আরাম তেমন চিত্তের সরসতার অনুকূল। বর্তমানে নীক্ষকের আগমনে শিক্ষকের দুশ্চিন্তা বাড়িয়া যায়, অথচ উভয়ের পরস্পর সাহচর্য একান্ত আবশ্যক। শাসনের আধিক্যে পালন অন্তর্হিত হইলে অন্তরাত্মা শুখাইয়া যায়।

মধ্যশিক্ষিত যুবক ছয় মাস শিক্ষক-শিক্ষা পাইলে আদ্যশিক্ষক

হইতে পারিবেন। এইরূপ, অন্ত্যশিক্ষিত যুবক শিক্ষক-শিক্ষা পাইলে মধ্যশিক্ষক হইতে পারিবেন। এইরূপ অধিশিক্ষিত হইতে অন্ত্যশিক্ষক শিখাইয়া লইতে হইবে। ইহা পরের কথা। এখন বঙ্গ ও ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে, পণ্ডিত-শিক্ষালয় হইতে, শিক্ষক নীক্ষক প্রদর্শক বাছিয়া লইয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। ইদানীর শিক্ষাপ্রাপ্ত পণ্ডিত শিক্ষাশালার সকল কর্মের যোগ্য হইবেন না। তাহাঁর পাণ্ডিত্য থাকিতে পারে, তাহাঁর শিক্ষা-কলা-জ্ঞানও থাকিতে পারে; কিন্তু,তিনি যে ভাবে শিক্ষিত হইয়াছেন, তাহাঁর কর্মস্থানে সে ভাব পাইবেন না। ইহাতে অসন্তোষ জন্মিবে এবং হয়ত দেশের পুত্রকন্যাকে সে অসন্তোষের ফল ভোগ করিতে হইবে। এই হেতু, ইহাঁকেও কিছুদিন নূতন শিক্ষায় দীক্ষিত হইতে হইবে। ইংরেজী ইস্কুলের ও কলেজের লব্ধ-বিদ্যের উৎসাহ থাকিলে, ছয় মাসে শিক্ষকের কর্মের যোগ্য হইতে পারিবেন। পাঠশালায় ও বিদ্যালয়ে ও ইস্কুলে ও কলেজে যে-সকল শিক্ষক আছেন, তাহাঁদের অনেকের দ্বারা কাজ আরম্ভ হইতে পারিবে। ইহাঁদিগকে শিখাইবার নিমিত্ত বই লিখিতে হইবে, বৎসরে দুইবার এক এক স্থানে আনাইয়া উপদেশ দিতে হইবে। যে পাঠক এতদূর পর্যন্ত পড়িয়া আসিয়াছেন, তিনি বুঝিয়াছেন, শিক্ষানীতি বলি, পদ্ধতি বলি, কিছুতেই প্রকৃত গুরু বা শিক্ষকের স্থান লইতে পারে না। গুরুই শিক্ষাশালার প্রাণ। এই প্রাণপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অকাতরে অর্থব্যয় করিতেই হইবে।

গুরুকুলে থাকিয়া শিক্ষিত হইবার সময় উত্তম ছাত্র ভাবী শিক্ষকের নিমিত্ত বাছিয়া রাখিতে হইবে। ইহারা বিনা ব্যয়ে শিক্ষা পাইবে এবং পরে গ্রাসাচ্ছাদন লইয়া চারি কি পাঁচ বৎসর বিনাবেতনে শিক্ষক হইবে। এইরূপ, শিক্ষকশিক্ষা পাইবার সময় ভাল ভাল ছাত্র বাছিয়া এবং বিনা ব্যয়ে শিখিতে দিয়া ভাবী শিক্ষক সংগ্রহ করিতে হইবে। এইরূপ, নানা উপায় আছে; কিন্তু এমন কোনও উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহাতে অর্থব্যয় নাই।

মধ্যশিক্ষায় চিন্তা।

আদ্যশিক্ষার সুযোগ অবশ্য সকলকেই দিতে হইবে। কারণ, তাহা না দিলে দেশের জন্মলব্ধশক্তি ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির তুল্য গুপ্ত থাকিবে। একদিকে আদ্যশিক্ষা অবশ্য দাতব্য, অন্যদিকে অতিশয় কঠিন, অতিশয় ব্যয়সাধ্য। কারণ যোগ্যাযোগ্য-নির্বাচারে দেশের

যাবতীয় পুত্রকন্যাকে দিতে হইবে। দুঃখের বিষয় এই থাকিবে, সকলের পক্ষে সমান ক্ষেত্র রচনা অসম্ভব। সকলের বাড়ী, সঙ্গ, সমাজ, আর্থিক অবস্থা সমান নয়। কাজেই অসমক্ষেত্র-পালিত বৃক্ষের ন্যায় অসমক্ষেত্র-পালিত শিশুও পুষ্টিতে ও বৃদ্ধিতে অসমান হইয়া পড়িবেই পড়িবে। বোধ হয় বৈষম্যরক্ষাই বিধাতার ইচ্ছা।

অথচ চেষ্টা করিতে হইবে। সে চেষ্টা বহুমুখী হইলেই বহুর মঙ্গল। মধ্যশিক্ষা-আরম্ভে কতকগুলি ভেদ মানিতে হইবে। (১) বঙ্গ-দেশেও অন্য দেশের ন্যায় বহু সমাজ-ভেদ আছে। যাবতীয় সমাজের পক্ষে মধ্যশিক্ষা এক করা বাতুলের কর্ম। অবশ্য সকলের পক্ষে নিজজ্ঞান ও দেশজ্ঞান অত্যাবশ্যক; কারণ, সকলকেই বাঁচিতে হইবে, সুখে স্বচ্ছন্দে বাঁচিতে হইবে। প্রভেদ এই, সকল সমাজের বা সকল লোকের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ এক নহে। (২) দেশভেদেও শিক্ষার বিষয়ের ভেদ কিছু করিতে হইবে। নদীবহুল কি সমুদ্রতটবর্তী লোকের পক্ষে নৌচালন শিক্ষা যেমন আবশ্যক, উচ্চভূমি প্রস্তরময় প্রদেশের পক্ষে তেমন নহে। (৩) পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে কাল ছিল, এখন সে কাল আর নাই। এখন অর্থকরী বিদ্যা কিছুই না জানিলে অধিকাংশ প্রজাকে মরিতে হইবে। যে পারে সে বিদ্যা লইয়া থাকিবে; হয় লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বিরোধ ভঞ্জন করিবে, কিংবা সরস্বতীরই উপাসক হইয়া থাকিবে। (৪) আর্থিক অবস্থাভেদ শিক্ষাবৈষম্যের এক গুরুতর কারণ। মধ্যশিক্ষা ও অন্ত্যশিক্ষা কিংবা অধিশিক্ষা দাতব্য হইবে না। কতজনকে বৃত্তি দিয়া এই শিক্ষার সুযোগ দেওয়া যাইতে পারিবে? ফলে দাঁড়াইয়াছে ও দাঁড়াইবে, অর্থ থাকিলে পণ্ডিত হইতে পারিবে, ধনার্জনবৃত্তি শিখিতে পারিবে; না থাকিলে মূর্খ থাকিবে, আরও দরিদ্র হইবে। কিন্তু মূর্খেরও ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে, বস্ত্রাভাবে শীতে শরীর কাঁপে এবং ইনফ্লুঞ্জার এক ফুৎকারে প্রাণবায়ু দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করে। (৫) দশ-বার বৎসর বয়সে নর-নারীর ভেদ আরম্ভ হয়। অতএব আমাদের দেশে বালকবালিকার আদ্য দ্বিতীয় শিক্ষা একত্র এক ভাবে হইতে পারিবে না। (৬) বয়সভেদে শিক্ষার ভেদ অবশ্যকর্তব্য। যে শিশু আদ্যশিক্ষা পায় নাই, যে বালকবালিকা বিনা শিক্ষায় বড় হইয়াছে, এবং অপরে যে স্ব স্ব বৃত্তিতে নিযুক্ত হইয়া কোনও ক্রমে জীবনধারণ করিতেছে, সে-সবেরও শিক্ষা চাই। এই ষড় ভেদ স্মরণ করিলে দেশে আপামর নরনারীর শিক্ষা-বিস্তার অতিশয় কঠিন বোধ হইবে। আদ্য-

শিক্ষা বরং সোজা, অপরাপর শিক্ষার আয়োজন সকলের পক্ষে সমান করা অসম্ভব।

শিক্ষা-পরিপাটি-চিন্তার পূর্বে দুইটি প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে। (১) ভারত ও বঙ্গ প্রায় স্বাধীন হইয়াছে। ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজন হ্রাস পাইয়াছে, যাহাঁরা উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞানচর্চা করিবেন, আর যাহাঁরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ও পৃথিবীর দেশ বিদেশের বার্তা বহন করিবেন, তাহাঁরা ইংরেজী ভাষা উত্তমরূপ শিখিবেন। ইহাঁদের সংখ্যা অতি অল্প। যে গুরুভারে বালকবালিকারা পীড়িত হইতেছিল, চরিত্রে যাহার কুফল ফলিতেছিল, তাহা অপসারিত হইল। (২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান কালোপযোগী শিক্ষনীয় বিষয় অবশ্য চিন্তা করিবেন। যাহাতে লব্ধজ্ঞান পুথিগত না থাকিয়া দিনযাত্রায় আসিতে পারে তাহাও চিন্তা করিবেন। সমাজে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন অল্প। সকলে সামান্যজ্ঞ হইলে দেশ উঠিতে থাকে। বর্তমানে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নির্ধারিত পাঠ্য চিন্তা করিলে মনে হয় অল্প বয়স হইতে বালকদিকে বিশেষজ্ঞ করিবার ইচ্ছা। কেহ সাহিত্য কেহ বিজ্ঞান অনুশীলন করিবে, এই ব্যবস্থায় একাঙ্গ বৃদ্ধি হইয়া মানুষকে কদাকার করে। বি এ, বি এস-সি পরীক্ষার পূর্বে সকল ছাত্রকে সমান বিবেচনা করিলে এই দোষ হইতে পায় না। সাহিত্যের ছাত্র ভূতবিদ্যা. বিজ্ঞানের ছাত্র তর্কবিদ্যা অবশ্য শিখিবে।

নিম্নে প্রদত্ত শিক্ষা-পরিপাটিতে এই নীতি অনুসৃত হইয়াছে। তথাপি বোধ হয় কিছু কিছু অপূর্ণতা রহিয়া গেল। বিষয়টি গুরুতর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজে ছাত্রেরা যাহা শিখিতেছে তাহা অবশ্যই চাই। রোগচিকিৎসা বিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা (ইঞ্জিনীয়ারিং), ভূবিদ্যা প্রভৃতির অতিরিক্ত যাহার প্রয়োজন বোধ হইতেছে কেবল তাহা এখানে পরিকল্পিত হইল।

শিক্ষা-পরিপাটি।

এখানে শিক্ষা-পরিপাটির স্থূল আভাস দেওয়া যাইতেছে।

আদ্য শিক্ষা প্রথম।

সকালী পাঠশালা। ৭টা—১০টা। বয়স ৬—৯ বৎসর। চারি বৎসর নয়াভ্যাস, ক্রীড়া-ব্যায়াম, শয়শিক্ষা, চিত্রলিখন। বাঙ্গলা ভাষায়

পাঠ,—নিজজ্ঞান, দেশজ্ঞান, সামান্য গণিত (টাকা আনা পয়সা, মণ সের ছটাক তোলা) কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কথামালা। (আদ্য শিক্ষার কোন পাঠ্যপুস্তকে ক্রিয়াপদের মৌখিক রূপ থাকিবে না। মধ্য শিক্ষাতেও এই বিধি পালন কর্তব্য। আমার প্রবর্তিত যুক্তাক্ষর শিখাইলে শিশু তিন মাসে সোজা সোজা শব্দ লিখিতে ও পড়িতে পারে। সে অক্ষরে বই ছাপাইতে হইবে।)

আদ্য শিক্ষা দ্বিতীয়।

বিকালী পাঠশালা। ২টা—৬টা। বয়স ১০—১২ বৎসর। এই বয়সের গ্রামের অসংখ্য বালক বালিকা পাঠশালায় আসিতে পারিবে না। বলপ্রয়োগ কর্তব্য হইবে না। বিশেষতঃ বালিকাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন হইবেই হইবে। যাহারা স্বেচ্ছায় পাঠশালায় আসিবে তাহাদের লইয়া তুষ্ট থাকিতে হইবে। নগরে বালক ও বালিকাদের বিকালী পাঠশালা পৃথক হইবে। শিক্ষণীয়—নয়াভ্যাস, ক্রীড়া-ব্যায়াম, শয়শিক্ষা চিত্র-লিখন। নিজজ্ঞান, দেহজ্ঞান, স্বদেশ বৃত্তান্ত, প্রাণী বৃত্তান্ত, বৃক্ষ বৃত্তান্ত। ক্ষেত্রমিতি, শুভঙ্করী, ত্রৈরাশিক। বালক-বালিকারা সংবাদপত্র পড়িতে ও বুঝিতে পারিবে। বালকদের ক্ষেত্রমিতি, বালিকাদের সোজা সেলাই।

সান্ধ্য পাঠশালা।

গ্রাম ও নগরে যে সকল বালক ও যুবক পাঠশালায় আসিতে পারিবে না, তাহারা সন্ধ্যা ৭টা—৯টা প্রত্যহ দুই ঘণ্টা অভ্যাস করিলে দশপনর দিনে আমার প্রবর্তিত অক্ষর যোজনা দ্বারা বাঙলা শব্দ লিখিতে ও পড়িতে পারিবে। সে অক্ষরে বই ছাপাইতে হইবে, পরে এক মাসের মধ্যে প্রচলিত ছাপার অক্ষর পড়িতে পারিবে। প্রথমে অক্ষর লেখা, পরে পড়া, পরে গণা। পাঠ্যপুস্তকে ধর্মের প্রশংসা, হিতোপদেশ, সাধুচরিত, দণ্ডনীতি, দেশবৃত্তান্ত, স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত দেহের, গৃহের ও গ্রামের শৌচরক্ষা, ইত্যাদি বিষয় জানিবে। শিক্ষার্থী অনুসারে চিত্রলিখন ও বৃত্তির মূল সূত্র ধরিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। একটা উদাহরণ দিতেছি। দেশে শিক্ষিত রাজমিস্ত্রীর অভাব আছে। বাঁকুড়ায় বাউরী ও অন্য জাতি রাজমিস্ত্রির কাজ করে। কিন্তু তাহারা নিজে দেখিয়া যাহা শিখিতে পারে, কেহ শিখায় না। তাহারা

শিক্ষার্থী হইলে ইটের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ মাপ, ঘনইঞ্চ, ঘনফুট গণনা করা, ইটের বিভিন্ন গাঁথনি, খিলান, চিত্রলিখন দ্বারা গৃহের স্থান আকার উচ্চতা নির্দেশ ইত্যাদি, ইটের মাটি, মাটির দোষ গুণ, পোড়াইবার বিধি, পাঁজা নির্মাণ, পাঁজার ঘন মাপ দ্বারা সংখ্যা, সুরকি, বালি, পাথুরে চূর্ণ, ঘষিমের চূর্ণ, সিমেণ্ট ইত্যাদি বিষয়ক ছোট বই লিখিতে হইবে। তাহারা পড়িবে। বুদ্ধিমান হইলে এক বৎসরে শিক্ষিত হইতে পারিবে। কেন শিখিতে আসিবে?—শিখিয়া অর্থ আনিতে পারিবে, মান হইবে, রামায়ণ পড়িতে পারিবে। তথাপি প্রথম প্রথম জনকয়েককে মাসে মাসে কিছু জলপানি দিতে হইবে।

মধ্যশিক্ষা।

বয়স ১৩—১৫ বৎসর। তিন বৎসর। ১০॥টা—৪টা সময়। কেহ বিদ্যালয়ে, কেহ শিক্ষালয়ে আসিবে। বালক বালিকার পৃথক। বর্তমান উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে মাতৃকা পরীক্ষার নিমিত্ত পাঠ্যের আড়ম্বর কমাইতে হইবে। তখন বিদ্যালয়ে ও শিক্ষালয়ে বালক ও বালিকাদের শিক্ষণীয়—রণাভ্যাস (drill), ব্যায়াম, চিত্রলিখন। পাঠ্য-পুস্তকে ২৫০ পৃষ্ঠা থাকিবে। ঈশ্বর-ভক্তি, সত্য, অহিংসা, দয়া, পরোপকারিতা, সংহতি, শৌর্য, সদাচার, দিনচর্যা, ঋতুচর্যা। পদ্য ৫০ পৃষ্ঠা। ব্যাকরণ ৫০ পৃষ্ঠা। সংস্কৃত ভাষা, চাণক্য শ্লোক ২০টি। হিতোপদেশ শ্লোক ২০টি। ভারতের ও বঙ্গের ইতিহাস; ইংলণ্ডের বর্তমান রাজ্যশাসন (১৫০ পৃষ্ঠা)। ভূগোল বৃত্তান্ত (৫০ পৃষ্ঠা)। দেশজ্ঞান—মাটির স্থূল উপাদান, পাথর, কর্মশিলা ও অকর্মশিলা, পাথরিয়া কয়লা, কেরোসিন, ধাতু। জল, বায়ু, বাষ্প, নদী, কূপ, পুষ্করিণী ও বৃষ্টিজলের উৎপত্তি। তাপ ও উষ্মা, তাপের পরিচালন, আলোক পরাবর্তন। দিক্‌নির্ণয়। ধ্রুব-মৎস্য, সপ্তর্ষি, কালপুরুষ, অগস্ত্য। পৃথিবীর দৈনিক গতি। উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা। প্রাণীবৃত্তান্ত—প্রাণীর প্রধান বিভাগ, চারিটি প্রাণীর বৃত্তান্ত। উদ্ভিদ বৃত্তান্ত—উদ্ভিদের প্রধান বিভাগ, চারিটি উদ্ভিদের বৃত্তান্ত। বস্ত্রের চতুর্বিধ উৎপত্তি (২৫০ পৃঃ)।

বালিকা বিদ্যালয়ে—গৃহস্থালী। চরকার প্রয়োজনীয়তা, কার্পাস তুলার পাইট, চরকায় সূতাকাটা, সেলাই। বালক শিক্ষালয়ে—

জ্যামিতি প্রয়োগ, যন্ত্র প্রয়োগ, কাষ্ঠকর্ম। অথবা বালক বালিকার শিক্ষালয়ে উদ্যান কর্ম, বীজ বপন হইতে বীজ উৎপাদন।

অন্ত্যশিক্ষা।

বয়স ১৬—১৮ বৎসর। তিন বৎসরে বি-এস-সি তুল্য জ্ঞানলাভ অভিপ্রেত। শিক্ষণীয় বিষয়—রণাভ্যাস, ব্যায়াম। বাঙ্গলা সাহিত্য, ভারত রাষ্ট্র রচনা (constitution), বঙ্গরাজ্য রচনা, আইনের মূল সূত্র, তর্ক বিদ্যা। বালকদের ইংরেজী ভাষা, মূর্ত বিজ্ঞান (applied science and mechanics)। বালিকাদের গৃহস্থালীর প্রত্যেক কর্মের হেতু ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, আয়ুর্বেদ হইতে দ্রব্যগুণ, মুষ্টিযোগ, রোগীর সেবা।

অধিশিক্ষা।

বয়স ১৯ বৎসর হইতে। অন্ত্য শিক্ষায় যুবক যন্ত্র প্রয়োগের জ্ঞান পাইয়াছে। এখন কলা ধরিয়া সে জ্ঞান কার্যকারী করিতে হইবে। কলা ও দ্রব্য নির্মাণ (manufacture) অসংখ্য, কিন্তু অধিকাংশ কলায় যন্ত্র-প্রয়োগ আবশ্যক। কলা শব্দ হইতে কল শব্দ আসিয়াছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের নিমিত্ত ছাত্র সুপ্রতিষ্ঠিত কলাশালায় ও কারখানায় শিক্ষার্থী হইবে। কেহ যান্ত্রিক (Mechanical Engineer), কেহ তাড়িত যান্ত্রিক (Electrical Engineer) হইবে। অধিশিক্ষালয়ে গবেষণা চালাইতে হইবে। যেমন—গ্রামে পুষ্করিণী দেশী পানা ও বিলাতী পানায় আচ্ছাদিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা কাগজ হইতে পারে না কি? গ্রামে নূতন কোন্ কলা চলিতে পারে? অধিশিক্ষালয়ে এইরূপ প্রশ্ন উঠিবে। ছাত্র নূতন নূতন দিক দেখিতে পাইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

দেশে জ্ঞান-প্রচার

(Mass Education)

দেশ-সম্বন্ধে কয়েকটা কথা কয়েক বৎসর সর্বদা শোনা যাইতেছে। কেহ বলিতেছেন, আমরা রোগে জর্জরিত হইতেছি; কেহ বলিতেছেন, দারিদ্র্যে নিষ্পীড়িত হইতেছি; এবং কদাচিৎ কেহ বা ধর্মের গ্লানি দেখিয়া সন্তপ্ত হইতেছি। কথাগুলা আদি কালের; কেবল এদেশে নয়, সব দেশের সবাই দীর্ঘায়ু হইতে চায় ধনশালী হইতে চায়, এবং কখন-কখনও বস্তুতঃ ধার্মিকও হইতে চায়। ধন নইলে জীবনরক্ষা হয় না, জীবন নইলে ধর্মও থাকে না। অতএব আদি যে ধন, তাহার উপায়-চিন্তা চলিতেছে। এদেশের এক নীতি-কার ধনার্জনের চারি উপায় নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—বাণিজ্য, কৃষি, রাজসেবা ও ভিক্ষা। তিনি কলাকে বাণিজ্যের অন্তর্গত করিয়াছেন। ভিক্ষা অনিশ্চিত ও নিন্দিত, রাজসেবা বা চাকরি দুর্লভ; অতএব ধনের পথ তিনটি, কৃষি, কলা ও বাণিজ্য। ধন, প্রাণ, ধর্ম, এই তিন লাভের এক উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। সে উপায় শিক্ষা। অতএব গোড়ায় শিক্ষা আসিয়া পড়িতেছে। এই সকল কথা পূর্বে এক ক্ষেত্রে কলেজের তর্কসভার বিচারের মতন করিয়া বলা গিয়াছে। চিত্ত জাগাইবার উদ্দেশ্যে তেমন করিয়া প্রত্যেক মতের যৎসামান্য সমালোচনাও করা গিয়াছে।

সমালোচনার প্রয়োজন আছে; কিন্তু দোষ দেখাইলেই শ্রেয় পথ আবিষ্কৃত হয় না। এটা না, সেটা না; এটায় এই দোষ, সেটায় সেই দোষ; ইত্যাদি বলিয়া দিলে উপকার হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু আদেশ না করিয়া কেবল নিষেধ করিলে উপদেশ-পালন দুষ্কর হয়, পা বাড়াইতে শঙ্কা হয়।

রাজা উদাসীন থাকিতে পারেন না। তিনি নানা উপায় দেখিতেছেন। স্বাস্থ্য-বিভাগ, কৃষি-বিভাগ, কলা-বিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ প্রভৃতি নানা বিভাগে নানা লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। অধ্যক্ষেরা পাঠ-শালায় গোড়াপত্তন করিতে বলিতেছেন। স্বাস্থ্যাধ্যক্ষ পাঠশালায়

স্বাস্থ্যরক্ষার বই ধরাইতেছেন; কৃষি-অধ্যক্ষ কৃষিতত্ত্ব শিখাইতে বলিতেছেন; শিক্ষাধ্যক্ষ nature study, moral training, manual training দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। তথাপি আমরা রোগা ছেলের মতন খুঁৎ-খুঁৎ করিতেছি; বলিতেছি, এ কি শিক্ষা, কতজনের বা শিক্ষা হইতেছে।

কিন্তু কি শিক্ষা চাই, এবং কেমন করিয়া সে শিক্ষা হইতে পারে, হইলে কি লাভ হইবে, তাহা বলিতে পারি কি না, সন্দেহ। সমাজ ছাড়িয়া ত শিক্ষা নয়; সমাজের হিতার্থেই শিক্ষা। সে সমাজ ইয়ুরোপের আদর্শে গড়িতে হইলে শিক্ষার যে পথ ধরিতে হইবে, তাহা স্পষ্ট দেখিতেছি। ভারতের আদর্শে গড়িতে হইলে পথ দেখিতে পাই না। সে আদর্শ ভাঙ্গনের মুখে পড়িয়াছে; কোথায় কি আকারে কতখানি থাকিবে, তাহা ভাবিয়া পাই না। আমরা ভারতের খানিকটা চাই, ইয়ুরোপেরও খানিকটা চাই। এই দুই জুড়িয়া এক করিতে পারা, এক চতুরস্র-শোভী সৌধ গড়িতে পারা, এক বিশ্বকর্মা ছাড়া কাহারও কর্ম নয়।

তথাপি একটা মোটা আদরা (model) আঁকায় দোষ নাই। শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়; জ্ঞানই কাম্য, শিক্ষা উপায়। সে জ্ঞান, দেখিয়া, শুনিয়া, বই পড়িয়া, জন্মিতে পারে। আমরা বই পড়িয়া জ্ঞান-লাভের দিকে অধিক হেলিয়া পড়িয়াছি। 'শিক্ষা' আর 'শেখা' একই কথা। কিন্তু 'শিক্ষা' বলিলে 'ক খ' কিংবা 'এ বি' লিখিতে ও পড়িতে শেখা মনে করি কেন? education=শিক্ষা, ঠিক। কিন্তু education=পাণ্ডিত্য, মনে করি কেন? আমরা যাহাঁকে educated বলি, তিনি বিদ্বান্, ইংরেজী লেখা-পড়া কর্মে শিক্ষিত (trained)। কিন্তু হাজার হাজার নরনারী আছে, যাহারা 'এ বি' দূরে থাক, 'ক খ'ও লিখিতে ও পড়িতে পারে না। তাহারা সবাই অ-শিক্ষিত (uneducated) বলিতে পারা যায় কি? শিক্ষা উত্তম না হউক, আমাদের মনের মতন না হউক, কিছু শিক্ষা পাইয়াছে, প্রায়ই প্রত্যক্ষ করিয়া পাইয়াছে, এবং পাইয়াছে বলিয়াই সংসার চালিতেছে। দেশের শতকে ৮৫ জন লিখিতে ও পড়িতে জানে না। কিন্তু ইহাও সত্য, লেখা-পড়া জানা ১৫ জন দ্বারা দেশ চলিতেছে না। সে ৮৫ জন আরও শিক্ষিত হইলে দেশ ভাল চলিত। অতএব তাহারা যে শিক্ষা পাইয়াছে, কিংবা পাইয়া থাকে, তাহার উপরে ভিত্তি

তুলিতে হইবে। গোড়ার এই কথা, শিক্ষা শব্দের অর্থ গোলে হরিবোল দিয়া ঢাকিয়া না ফেলিয়া দেশকে ধরিয়া, জ্ঞানপ্রচার করিতে হইবে।

যে কাজ যে করিতে চায়, তাহাকে সে কাজের যোগ্য করা শিক্ষা-দান বা শেখাবার উদ্দেশ্য। পাঠশালায়, কিংবা বঙ্গ-বিদ্যালয়ে, কিংবা ইংরেজী ইস্কুলে, ছেলেরা যে শিক্ষা পাইতেছে, তাহাতে লেখা-পড়ার চাকরি করিবার যোগ্যতা হইতেছে। এই চাকরিতে মান আছে, টাকা আছে, অথচ আয়ের ক্ষতির আশঙ্কা নাই। কতক লোককে চাকরি করিতে হইবেই। তাহারা করিতে ইচ্ছুক না থাকিলে ভুলাইয়া করাইতে হইবে। অতএব দুইটা বল আমাদিগকে চাকরির দিকে টানিতেছে। একটা টান, অপরটা ঠেল।* এমন দুই বল ঠেলিয়া দিয়া অন্য পথে চলা, লক্ষে একজন পারে কিনা সন্দেহ। কে পারে? যাহার আত্মপ্রত্যয় কিংবা ধর্মে মতি হইয়াছে, সে পারে।

---

*ইংলণ্ডেও নাকি এই অবস্থা। সে দেশেও পণ্ডিত ও কেরাণী করিবার যোগ্য শিক্ষা প্রচলিত ছিল। ইয়ুরোপের প্রথম মহাযুদ্ধের পর 'গোড়া দেখ' ডাক পড়িয়াছে। যুদ্ধে প্রত্যহ ৯ কোটি টাকা খরচের দিনেও শিক্ষার নিমিত্ত অতিরিক্ত ৬ কোটি বরাদ্দ হইয়াছে। ছিল ৩০ কোটি, এখন হইয়াছে ৩৬ কোটি। শিক্ষার গতিক ভাল নয়, একথা যুদ্ধের পূর্বেও শোনা যাইতেছিল। এ বিষয়ে কয়েকটা মত A Policy of Rural Education. By S. H. Fremantle C.I.E. Printed at the Pioneer Press, Allahabad, 1915. এই পুস্তিকা হইতে উদ্ধার করিতেছি। Sir John Gorst said in 1911: "We are spending millions...on what is called education; ...the greater part of this money is, under the present system, wasted and might as well, so far as education is concerned, be thrown into the sea." Mr. E. Holmes, the Chief Inspector of Elementary Schools, does not stop at declaring the education to be useless: he declares that it is positively harmful. Another witness, Alexander Paterson, says: "At our elementary schools we seem to aim at producing a nation of clerks, for it is only to a clerk that the perfection of writing and spelling attained is a necessary training." The poor Law Commissioners say, "Our expensive Elementary Education System (costing £20,000,000 annually) is having no effect on poverty; it is not developing self-reliance or forethought in the characters of the children and is in fact persuading them to be clerks rather than artisans."

এখানে এ বিষয় সম্যক্ আলোচনার স্থান হইবে না। তবে দেখা যায়, পাঠশালা হইতে কলেজ পর্যন্ত যে শিক্ষা হয়, তাহা প্রায়ই দেশ-ছাড়া শিক্ষা; যেন আমরা বিদেশী, দিন কয়েকের তরে প্রবাসে আসিয়াছি। ঘরে কি আছে, কি হইতেছে; বাড়ীর পাশে কি আছে, কি হইতেছে; এই জ্ঞান জন্মিলে আত্মপ্রত্যয় জন্মিতে পারিত। পাঠ্য-বিষয়ের মধ্যে এক ভূগোল আছে, যাহা হইতে দেশ-জ্ঞান কিছু জন্মিতে পারিত। কিন্তু 'ভুগোল'-সংজ্ঞা সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে, পঠনও অনাদৃত রহিয়াছে। ইস্কুলে অনাদৃত, কলেজেও অনাদৃত। কলেজে কলেজে বিজ্ঞান শিখাইবার আয়োজন হইয়াছে, কিন্তু অমূর্ত (theoretical) বিজ্ঞান,—যাহার সহিত দেশ-কাল-পাত্রের সম্বন্ধ নাই, যাহা এদেশে না শিখাইয়া অন্য দ্বীপে শিখাইলেও চলিত। নানা-কারণে রাজা ধর্মশিক্ষার ভার লইতে পারেন নাই। সে ভার, আমাদের উপরেই আছে। কিন্তু আমরা উদাসীন। রাজার উপর সব ভার দিয়া এমন জড়ভরত হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদের নিজেদের কর্তব্য ভুলিয়া গিয়াছি। তিনি আমাদের সমাজ-বিধিতেও হাত দিতে পারেন না, অথচ সমাজই প্রধান শিক্ষা-ক্ষেত্র। বুদ্ধি মার্জিত হইলে কি হইবে; সমাজ যে বুদ্ধি-প্রয়োগের ক্ষেত্র। অতএব বর্তমান দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ জ্ঞান দ্বারা পাণ্ডিত্য জন্মিতেছে, নাস্তিক্য প্রসারিত হইতেছে, সন্তোষ অদৃশ্য হইতেছে, সুখে শান্তিতে সংসারযাত্রা-নির্বাহের সামর্থ্য হ্রাস হইতেছে। জনসাধারণের অর্থ চাই, বলাই বাহুল্য। কিন্তু ধর্মও চাই। ইহাই আমাদের শিক্ষার নীতি। ধর্ম, অর্থ, কাম,—এই তিনের লাভ আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, আমাদের পুরুষার্থ। কিন্তু ত্রিবর্গের প্রথমে ধর্ম। কারণ ধর্মব্যতিরিক্ত অর্থ, অকল্যাণের হেতু; ধর্মব্যতিরিক্ত কাম, স্বেচ্ছাচারী করে; আর, ধর্মব্যতিরিক্ত শিক্ষা দ্বারা পাঁজির ব্যতিপাত-যোগের সম্ভাবনা। যোগের অশুভ ফল ঘটিতেও আরম্ভ হইয়াছে। এখন সাবধান না হইলে, গন্তব্য উত্তমরূপে স্থির না করিলে, ধর্মকে কর্ণধার না করিলে, কখন্ কোন্ আবর্ত-কূপের টানে পড়িয়া অতল-গর্ভে নিমজ্জিত হইব, কে জানে। কালস্রোত রোধের সাধ্য নাই; কিন্তু স্রোত ধরিয়া গন্তব্যেও উপস্থিত হইতে পারি।

এই ভূমিকার পর শিক্ষার কয়েকটা সূত্র অন্বেষণ করি। কথোপকথনক্রমে বলিলে, বোধ হয়, কথাটা স্পষ্ট হইবে। অতএব গণেশ ও প্রমথ, দুই জন কি বলে, শুনি।

প্রমথ॥ দেশে যে নানা অভাব। প্রথমে কোন্ অভাব দূর করা উচিত।

গণেশ॥ এই যে অভাব-বোধ, এই বোধ জন্মানা প্রথম কর্তব্য। তুমি আমি কাগজে কলমে বোধ করিলেই, অভাব দূর করিতে পারিবে না। যাহারা দেশ, তাহারা অভাব বোধ করে কি?

প্রমথ॥ অভাব বোধ করে না? এই গ্রীষ্মকাল পড়িয়াছে, অমনই খাবার জলের অভাবে লোকে কি করিবে খুঁজিয়া পাইতেছে না।

গণেশ॥ কষ্টবোধ-টা বাস্তবিক কি? বাস্তবিক হইলে কষ্ট দূর করিতে পারিত না কি? কষ্টে পড়িলে লোকে মন্ত্রণা করে, মন্ত্রণা হইতে কর্ম আসে। কিসে কি হয়, লোকে জানে না। এই জ্ঞান দেওয়াই প্রথম কর্তব্য।

প্রমথ॥ তাহা হইলে ত গ্রামে-গ্রামে পাঠশালা বসাইতে হয়।

গণেশ॥ পাঠশালায় পাঠ পড়াইয়া যে জ্ঞান জন্মাইবে, সেটা কেতাবী জ্ঞান। শোনাইয়া, দেখাইয়া জ্ঞান জন্মাও। সে জ্ঞান হইতে প্রয়োগ (application) আসিবে এবং প্রয়োগ হইতে আত্মবত্তা (self-reliance) আসিবে।

প্রমথ॥ কিসের জ্ঞান? কি জ্ঞান?

গণেশ॥ নিজ-জ্ঞান ও দেশ-জ্ঞান। নিজ-জ্ঞান দুই ভাগ করিতে পার; দেহ-জ্ঞান ও আত্ম-জ্ঞান। আমরা আছি,—এই কথা বলিলে বুঝি আমাদের দেহ আছে, আর সুখ-দুঃখ ভোক্তা আত্মা আছে। কি করিলে দেহের কি হয়, এক কথায় দেহের স্বাস্থ্যরক্ষার জ্ঞান চাই। সঙ্গে সঙ্গে আত্মার স্বাস্থ্যরক্ষার জ্ঞানও চাই। দেহ রক্ষিত, কিন্তু অসুখী, এমন লোক প্রত্যহ দেখিতেছ। আত্ম-জ্ঞান, একটা বৃহৎ কথা। সেটা না বলিয়া ধর্মজ্ঞান বলিতে পার। এখানে ধর্ম সদাচার (right conduct)। দেহজ্ঞান ও ধর্মজ্ঞান পৃথক করিতে পারা যায় না। একারণ আয়ুর্বেদে ও ধর্মশাস্ত্রে দুইই একত্র বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের ধর্ম শব্দে ইংরেজী religion বুঝিবে না। একবার, একবার কেন, ইংরেজী ১৯০১ সনের লোকসংখ্যান-সময়ে সংখ্যাকারী এক পাড়ায় গিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "তোমার ধর্ম কি?" আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। যাহাকে প্রশ্ন হইল, সে উত্তর করিতে পারিল না; এক বৃদ্ধকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, আমার ধর্ম কি?" বৃদ্ধ মাথা চুলকাইয়া খানিক ভাবিয়া বলিল, "তোমার ধর্ম তোমার।" সংখ্যাকারী ফাঁপরে

পড়িয়া গেল। কারণ, ফার্মের কাগজে ধর্ম শব্দের নীচে 'তোমার' লিখিবার আদেশ ছিল না। বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ধর্ম কি?" "আমার ধর্ম আমার, একথা আবার কি জিজ্ঞাসিতেছ?" তখন সংখ্যাকারীও অধীর হইয়া পড়িয়াছে; জিজ্ঞাসিল, "তুমি হিন্দু, না মুসলমান?" বৃদ্ধও অধীর হইয়া বলিল, "তাই বল না! আর, আমি যে হিন্দু, তা আমার গলায় মালা দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছ না?" উত্তর-প্রত্যুত্তর শুনিয়া আমি হাসিলাম বটে, কিন্তু বুঝিলাম, বৃদ্ধই ঠিক। যখন লোকে রাগিয়া বলে, 'তোমার ধর্মে যা আছে কর', তখন বলে না বেদে কোরাণে কি বাইবেলে যা আছে। এখানে ধর্ম sense of justice। নিজজ্ঞান দিতে গেলেই দেশজ্ঞান দিতে হইবে। আমি আছি, কোনও দেশে আছি, কোনও কালে আছি। সে দেশ কেমন, সে কাল কেমন, তাহা না জানিলে নিজকে রক্ষা করা অসম্ভব। দেশ বলিতে কেবল মাটি নহে; আমাকে বেড়িয়া যা কিছু আছে, সব। মাটি জল বায়ু অন্তরীক্ষ, গাছপালা জীবজন্তু, মানুষ প্রভৃতি যাহাদের মাঝে আছি, সেটা আমার 'দেশ'। ইংরেজীতে environment। কিন্তু আমার 'দেশ' দশ বছর আগে যেমন ছিল, আজি তেমন নাই; কালি যেমন ছিল, আজি তেমন নাই; আমি যেমন ছিলাম, এখন আমিও তেমন নাই। এই যে অবিরাম পরিবর্তন-স্রোত, সেটা 'কাল'। লোকে বলে, 'সে কাল আর নাই'। নাইই ত; যে ঘটনা-পরম্পরা ছিল, তাহা এখন নাই, থাকিতে পারে না। অতএব যদি আমাকে সুস্থদেহে সুস্থচিত্তে থাকিতে হয়, তাহা হইলে আমাকে দেশ জানিতে হইবে, কালও জানিতে হইবে। আমি আছি; আমার থাকা যাহাদের উপর নির্ভর করিতেছে, তাহাদের 'দেশ' বলিতেছি। ইহার মধ্যে 'কাল'ও আনিতেছি। 'দেশ' আমার ধর্মের অনুকূল কি প্রতিকূল, দেশের 'ধর্ম' কি, এই জ্ঞান দেশ-জ্ঞান। ভূগোল ও ইতিহাস, এই জ্ঞান দিতে রচিত হয়। দেখিতে গেলে ভূগোলেই ইতিহাস, সমাজনীতি, রাজনীতি, বাণিজ্য, ব্যবসায় (industry), বার্তা (occupation) প্রভৃতি আমার জীবন-ধারণের নিমিত্ত আবশ্যক দেশ-জ্ঞান, সব পাইবার কথা। অথচ পাঠশালা, কি উচ্চ বিদ্যালয়ে, এই দেশ-জ্ঞান অনাদৃত রহিয়াছে। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ পাঠ, যাত্রাগান ও নিত্য নৈমিত্তিক পূজা পার্বণ দ্বারা ধর্মজ্ঞান কিছু জন্মিয়া থাকে; কিন্তু দেহ-জ্ঞান ও দেশ-জ্ঞান জন্মাইবার উপায় প্রচলিত নাই। যাহাঁরা কবিরাজ কি ডাক্তার, কেবল তাহাঁরাই দেহ-জ্ঞান

লাভ করেন। অথচ সকলেরই কিছু না কিছু পাওয়া আবশ্যক। যাহাঁরা "শিক্ষিত" তাহাঁদেরও সকলের দেশ-জ্ঞান নাই।

প্রমথ॥ তবেই ত পাঠশালা চাই।

গণেশ॥ পাঠশালা নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু পাঠশালা দ্বারা নিজ-জ্ঞান ও দেশ-জ্ঞান দেশময় ব্যাপ্ত করিতে বহুকাল লাগিবে। এখন বঙ্গদেশে ৩৬ হাজার পাঠশালা আছে। ৪॥০ কোটি লোকের ৶১০ আনা যদি পাঠশালা যাইবার বালক ও বালিকা ধরা যায় এবং ৩০টির তরে একটা পাঠশালা দরকার হয়, তাহা হইলে ২ লক্ষের উপর পাঠশালা চাই। কেবল বালকদিগের নিমিত্ত ১ লক্ষ পাঠশালা বসাইতেও ত বহুকাল যাইবে। তা ছাড়া, আর যে বার-তের আনা, যাহারা পাঠ-শালার মুখ দেখে নাই, তাহারা ত ছেলে সাজিয়া পাঠশালায় আসিতে পারিবে না।

প্রমথ॥ পাঠশালায় আসিতে পারিলেই বা কি ফল হইত?

গণেশ॥ বিশেষ কিছুই না। আসিতে পারিলে 'কখ" লিখিতে ও পড়িতে পারিত। কিন্তু যে অন্ন চায়, তাহাকে 'অন্ন' বানান করিতে শিখাইয়া বিদায় করা, উপহাস করার তুল্য। তা ছাড়া, পাঠশালা ছাড়ার পর লেখা-পড়ার অভ্যাস রাখিতে না পারিলে পাঠশালায় আসাই অকারণ। ইহাদের বোধগম্য করিয়া বই লিখিতে হইবে, ইহাদের অর্থ-গম্য করিয়া বেচিতে হইবে। এমন একখানাও বই দেখি না, যাহা স্বল্পাক্ষর পড়িতে পারে, পড়িয়া নিজ-জ্ঞান ও দেশ-জ্ঞান লাভ করিতে পারে। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি যাহা আছে, তাহা আপনা-আপনি আছে, কেহ ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহাদের হিতার্থে ছাপায় নাই। দামও বেশী; এক আনা দুই আনায় পাওয়া যায় না।

প্রমথ॥ তাহা হইলে উপায়?

গণেশ॥ ছেলে হইতে বুড়া পর্যন্ত, সকলের শিক্ষার নিমিত্ত এক উপায় হইতে পারে না। আমরা এক উপায়, পাঠশালার দিকে তাকাইয়া বসিয়া আছি। মনে কর, যেন দেশের সব ছেলে-মেয়েকে পাঠশালায় টানিয়া আনা গেল। ইহারা মানুষ হইতে অন্ততঃ দশ-বার বৎসর লাগিবে। এই দশ-বার বৎসর কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকা উচিত? "শিক্ষা-বিস্তার" বল, আর জ্ঞান-প্রচার বল, একটা স্রোত চালাইতে না পারিলে সে জল স্বাদু ও হিতকর হইবে না। নানা উপায়ে সে স্রোত রক্ষা করিতেই হইবে। ছেলে-মেয়েদের তরে পাঠশালা কর, স্বল্পাক্ষরের

তরে নানাবিধ কাজের বই লেখ, নিরক্ষরের তরে কথকতা কর। সকলের তরেই কথকতা চাই, প্রদর্শন চাই। শোনাইয়া, দেখাইয়া জ্ঞান-প্রচার সহজে হয়, শীঘ্র হয়। একথা পরে হইবে। প্রথমে পাঠশালা ধর। পঞ্চম বর্ষে হাতে খড়ী দিতে পার; কিন্তু জানিবে দশম বর্ষে পাঠশালা ছাড়িলে লেখা-পড়া-শেখা বৃথা হইবে, শেখা পাকা হইবে না, থাকিবে না। ১১।১২ বৎসর বয়স হইতে ১৪।১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত যাহা শিখিবে, সেটা বরং থাকিবে। কিন্তু ১০।১২ বৎসর বয়স হইলেই পুত্র পিতার সঙ্গে কাজ করিতে শিখিতে আরম্ভ করে, কাজ করিবার কিছু জ্ঞানও জন্মে। এই বয়সে কন্যার বিবাহ আছে, ঘরকন্নার কাজ আছে। কন্যার শিক্ষা-সমস্যা ভারি কঠিন, বধূর শিক্ষা আরও কঠিন। সম্প্রতি ইহাদের ১০ বছর বয়সে পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত মনে করিতে হইবে। কিন্তু পাঠশালা ছাড়িয়া বধূ হইয়াও যাহাতে লেখাপড়ার অভ্যাস থাকে, তাহার উপায় করিতে হইবে। ইহার এক উপায়, বধূ ও গৃহিণীর যোগ্য জ্ঞান-পূর্ণ বই লেখা ও সস্তায় বেচা।

প্রমথ। যত রাজ্যের গল্পের বই বধূরা পড়ে। গল্পের মতন গল্প হইলে বরং কিছু উপকার হইত। এমন গল্প, যাহা পড়িলে সংসার-ধর্মে অবসাদ, গৃহকর্মে ক্লান্তি আসে, এবং পরীর রাজ্যে স্বচ্ছন্দে উড়িয়া বেড়াইবার বাসনা জন্মে।

গণেশ॥ কেবল বধূদের দোষ দেওয়া কেন, যুবারাও গল্পের কুহক এড়াইতে পারে না। তাহারাই কিনিয়া দেয়। কতকটা বয়সের ধর্ম; আর কতকটা দেশের অভাগ্য, ভাল বই নাই। আরও অভাগ্য কেহ কেহ একটা ইংরেজী কথা, 'আর্ট' (art) নামের কুহকে মুগ্ধ হইয়াছেন; 'আর্ট'-জন্য মানুষ, কি মানুষ-জন্য 'আর্ট', বিচারে দিশা-হারা হইয়া পড়িতেছেন। উপরের জল নীচে গড়ায়, যাহা 'বড়'লোকে করে, তাহা 'ছোট'লোকও করিতে চায়। 'শিক্ষা' শব্দের অর্থ সঙ্কীর্ণ করিয়া, সমাজের শিক্ষা চাপা দিয়া রাখিয়াছি। শিক্ষার ক্ষেত্র পাঠশালা নয়, সমাজ। বুড়া বয়সে বিবাহ করিয়া, বিবাহ করিতে বর কিনিয়া, সমাজ নিজের বধূকে যে শিক্ষা দিতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ। পাঁচখানা বই পড়াইয়া, দশটা কবিতা লেখাইয়া প্রত্যক্ষ শিক্ষার দোষ কাটাইতে পারা যায় না। এই কারণে পূর্বে বলিয়াছি, বধূ-শিক্ষা অতিশয় কঠিন।

প্রমথ॥ গ্রামের সব ছেলে পাঠশালায় আসিবে কি?

গণেশ॥ সব পাঠশালা এক রকম হইলে আসিবে না। ১০ বছর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকা, ধনী-দরিদ্র, গ্রাম ও নগরে সকলের শিক্ষা সমান হইবে। ইহাদের নিমিত্ত কেবল সকালে পাঠশালা বসিলে ভাল। ইহাদিগকে দুইবেলা পাঠ পড়ানার চেষ্টা না করাই ভাল। গ্রাম ছোট হইলে একটি; বড় হইলে পাড়ায় পাড়ায় পাঠশালা চাই, নতুবা সব ছেলে-মেয়ে পাইবে না, ১০।১২ জনের অধিক হইলে গুরুমশায়ও পড়াইতে পারিবেন না। এই সকালী পাঠশালার পড়া সাঙ্গ হইলে, কেহ বিকালী পাঠশালায় যাইবে, কেহ বা 'বঙ্গবিদ্যালয়ে' যাইবে। 'বঙ্গবিদ্যালয়ে' কি বিদ্যা শিখিবে, তাহা এখন ভাবিবার দরকার নাই। এখন জনশিক্ষার কথা হইতেছে। বিকালী পাঠশালা কেবল বিকালে বসিবে। এখানে ছেলেরা ১৪।১৫ বছর বয়স পর্যন্ত আসিতে পারিবে। সকালে ইহারা পিতার কাজ, কি ঘরে কাজ করিবে, বার্তা শিখিবে। বিকালী পাঠশালা দুই রকমের হইবে। যে গ্রামে সকালী পাঠশালায় ছেলেরা ১০।১১ বৎসর পর্যন্ত কিছু শিখিয়াছে তাহাদের পক্ষে যে পাঠ, যাহারা পাঠশালা মাড়ায় নাই তাহাদের পক্ষে সে পাঠ হইতে পারে না। দুই-তিন গ্রামের মধ্যে একটা বিকালী পাঠশালা থাকিলেই চলিবে। বিকালী পাঠশালায় বাঙ্গালা ভাষা, সাহিত্য নয় ভাষা, শিখিবে; আবশ্যক অঙ্ক দেশীয় রীতিতে শিখিবে; অক্ষর-লেখা ও চিত্র-লেখা শিখিবে। বই একখানি পাইবে; তাহা হইতে ভাষা, এবং নিজ-জ্ঞান ও দেশ-জ্ঞানের আভাস পাইবে। তাহাতে সূচনা থাকিবে, গুরুমশায় সেই সূচনা ধরিয়া মুখে-মুখে জ্ঞান জন্মাইতে চেষ্টা করিবেন। এক প্রহর সময়ের মধ্যে অধিক আশা করা যাইতে পারে না। মুখে-মুখে শিক্ষা না পাইলে সময়ে কুলাইবে না, জ্ঞানও পাকা হইবে না।

প্রমথ॥ এমন গুরুমশায় কোথায়?

গণেশ॥ ইহাই দারুণ চিন্তা। কিন্তু দারুণ ভাবিয়া নিশ্চেষ্ট হইলেও চলিবে না। গুরুমশায় করিয়া লইতে হইবে। ইহাঁদের শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় করিয়া সেখানে শিক্ষা দিয়া গ্রামে-গ্রামে পাঠশালা বসাইতে হইলে এক যুগ লাগিবে। যাহাঁরা সেখানে শিক্ষিত হইবেন, তাহাঁরা বরং পরিদর্শক হইতে পারিবেন। তাহাঁরা, এবং এখন যাহাঁরা পরিদর্শক আছেন তাহাঁরা, গুরুমশায়দিগকে গ্রামে গ্রামে শিখাইয়া বেড়াইতে পারিবেন। তাহাঁরা চারি-পাঁচ-খানা গ্রামের

গুরুমশায়কে এক পাঠশালায় আনাইয়া নিজেরা দুই তিন দিন গুরু-মশায়ি করিয়া দেখাইবেন। যে দেশ-জ্ঞান প্রচারের কথা বলিতেছি, সে সবের কথক ও প্রদর্শকের নিকট হইতেও গুরুমশায়েরা কিছু কিছু শিখিতে পারিবেন। পাঠশালার পরিবর্তে, 'বিদ্যালয়', এবং গুরুমশায়ের পরিবর্তে 'পণ্ডিত মহাশয়' বলিও না। 'গুরু'-এতবড় মানের কাছে, 'পণ্ডিত' নাম ছোট। কিন্তু সব ছেলেকে এক ছাঁচে ঢালা ঠিক হইবে না। বিকালী পাঠশালায় নানা ছাঁচ রাখিতে হইবে। কেবল বাটী, কেবল ঘটী দিয়া ছোট সংসারও চলে না।

প্রমথ॥ তাহা হইলে ত খরচের অন্ত থাকিবে না।

গণেশ॥ তবে আর খরচ কিসে? তুমি দেশটাকে শিক্ষিত করিতে চাও, বার্তা ও কলায় ও ধর্মে শিক্ষিত করিতে চাও। পাঠ-শালায় দুই তিন ঘণ্টায় কিসের কতটুকু শিখাইতে পারিবে? যদি নানা বিষয়ের ছোট ছোট কিন্তু সুন্দর সুন্দর বই ছাপাইয়া গ্রামে গ্রামে /০ দামে বেচিয়া বেড়াইতে পার তাহা হইলেও সে-সব বই পড়াইতে পারিবে না। পাঠশালা ছাড়িতে না ছাড়িতে দ্বিতীয় শিক্ষায় প্রবেশ করাইতে হইবে। এই শিক্ষা জ্ঞান-প্রচারের অন্তর্গত হইবে। জ্ঞান-লাভের নানা পথ আছে; একটা পথ বই পড়িয়া। কিন্তু এ পথ সকলের পক্ষে সোজা নয়; সে পথে চলা যাহাদের অভ্যাস নাই, তাহারা দুই পা যাইতে না যাইতে হাঁপাইয়া পড়ে। যাহারা বিকালী পাঠশালায় পড়িয়াছে, এবং যাহারা না পড়িয়াছে, সকলকেই এই পথে আনিতে হইবে। পথটা সুন্দর সুগম করিতে হইবে। সাধারণ লোক সদ্য ফলই বোঝে; কারণ অজ্ঞানের তিমিরে দূরে ঝাপসা ঠেকে।

প্রমথ॥ সে কাজ সোজা হইবে না। সদ্য সদ্য কি ফল দেখাইতে পারা যাইবে?

গণেশ॥ সোজা ত নহেই। সকলকেই অর্থ-ফল দেখাইতে হইবে না। এখন সে আর কুয়ার বেং নয়; পাশে বিপুল পৃথিবী আছে, যেখানে ইচ্ছা সেখানেই সে যাইতে পারে। এই যে আত্ম-শক্তি সেই শক্তি জাগাইতে পার। ইহার আদি আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষা আপনি জাগে, যদি উদাহরণ দেখাইতে পার। এ নিমিত্ত,

(১) গ্রাম তোমার নিকট আসিবে না; তোমাকে গ্রামে যাইতে হইবে।

(২) গ্রামে গ্রামে জ্ঞান বিতরণ কর। বিতরণ নহে, দান ত নহেই, বিলাও। কোথাও কেহ শুনিবে মানিবে, কোথাও কেহ শুনিবে না, শুনিলেও মানিবে না। তুমি ধৈর্য ধরিয়া বিলাইতে থাক।

(৩) শুধু কান দিয়া শোনানা নহে, চোখে দেখাও। চোখ দিয়া দেখিলে, হাত দিয়া নাড়িলে যে জ্ঞান জন্মে, সেটাই পাকা।

প্রথম॥ দেখাইব কি?

গণেশ॥ দেশের কোথায় কি আছে, কিসে কি হইতেছে, কিংবা হইতে পারে, তাহা কোনও দ্রব্য হইলে বহিয়া লইয়া গিয়া দেখাইবে; তাহা না হইলে, কর্ম কিংবা গুণ হইলে, ছায়াচিত্র (magic lantern slides) দ্বারা বুঝাইবে। তাহার সাহায্যে জ্ঞানটা স্পষ্ট করিবে। দেহ-জ্ঞান বিলাইলে লোকে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে জানিবে, আত্ম-জ্ঞান জন্মিলে মানুষ হইবে, আর দেশ-জ্ঞান পাইলে নির্বিঘ্নে জীবন ধারণ করিতে পারিবে। আমি যাহা তিনভাগে ভাগ করিয়াছি, প্রাচীনেরা তাহা চারিভাগ করিতেন। চাণক্য বলিতেন, বিদ্যা, যাহা জানিতে হইবে, চারিটি,—আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি। আন্বীক্ষিকী—অনুপশ্চাৎ ঈক্ষণ দর্শন, জগতের কার্যকারণ দর্শন (Logic); ত্রয়ী—তিন বেদ, যাহা হইতে ধর্মশাস্ত্রের উৎপত্তি; বার্তা—জীবিকা, যাহা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারা যায়; দণ্ডনীতি—দেশের আইন। ইহার একটিও বাদ দিতে পারা যায় না। বিপদে ও অভ্যুদয়ে বুদ্ধিকে স্থির রাখিতে পারে, এক দর্শন। ধর্মশাস্ত্রে আচার ব্যবহার শেখায়। আচার দ্বারা দেহের ও মনের স্বাস্থ্য নিষ্পন্ন হয়; ব্যবহার দ্বারা সমাজে তিষ্ঠিতে পারা যায়। আমাদের সমাজে যে ব্যবহার আছে, অন্য সমাজে ঠিক সেরূপ নাই। যে ব্যবহার উত্তম বলিয়া সমাজে বিবেচিত হয়, তাহা ন্যায়। অতএব ধর্মশাস্ত্রে ধর্মাধর্ম, ন্যায়ান্যায় শেখায়।

প্রমথ॥ দেহ-জ্ঞান কই? সাধারণ লোককে দর্শন শিখাইতে হইবে?

গণেশ॥ ধর্মশব্দে religion (a system of faith and worship) মনে করিতেছ কেন? ধর্মশাস্ত্রে শারীরধর্ম-পালনের সূত্রও আছে। আয়ুর্বেদে দেহজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান, দুইই আছে! দর্শনের নামে চমকাইলে কেন? জন্মান্তর ও কর্মফলে বিশ্বাস কোন্ হিন্দুর না আছে? যদি কাহারও না থাকে, সে জানে না। পূর্বজন্মের

ফলে এ জন্মে সুখ-দুঃখ ভোগ করি এবং এ জন্মের সুকর্ম ও দুষ্কর্মের ফল পরজন্মে ভোগ করিতেই হইবে। এই বিশ্বাসেই হিন্দু সমাজ টিকিয়া আছে। কর্মফলে বিশ্বাস করিতে গেলেই জন্মান্তরে বিশ্বাস করিতে হইবে। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ, দেশের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থে এই কথা পুনঃ-পুনঃ পাইবে।

প্রমথ॥ সে সব তো উপাখ্যান, গল্প।

গণেশ॥ গল্প বলিও না; শাস্ত্র না বল, ইতিহাস বল। ইতিহাস হইতে যদি দুরূহ দর্শন পর্যন্ত শিখিতে পার, যে দর্শন তর্কাতর্কি নয়, তোমার চরিতের মন্ত্রী হইবে, সে ত উত্তম ইতিহাস। তুমি ইস্কুলে ইস্কুলে moral training দিতে চাও; কিন্তু কি করিয়া training দিবে, ভাবিয়া পাইতেছ না। ইহার একটা কারণ, এই সব গ্রন্থ গল্পের বই মনে করিয়াছ; আর একটা কারণ, moral trainingএর বাঙ্গালা "নীতিশিক্ষা" করিয়াছ। সেকালের লোকে এবং একালেরও শতকে অন্ততঃ ৯২ জন moral training বা "নীতিশিক্ষা" বুঝিবে না। তাহারা ইহাকে ধর্মের অন্তর্গত করে। ধর্ম=religion মনে করিয়া অনেক অনর্থ হইতেছে। ধর্ম ও কর্মে ভেদ করিতে গিয়া নীতির অবলম্বন হারাইয়া ফেলিতেছ। এক আখ্যায়িকা শোন। অনেককাল হইল বর্ধমানের আদালতে এক বাঙ্গালা-শিক্ষিত ভদ্রলোক চাকরি করিতেন। বেতন অল্প। একদিন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাহাঁর বাসায় আসিয়া কন্যাদায় জানাইলেন। শুনিবামাত্র তিনি দুইটি টাকা দান করিলেন। আমি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসিলাম, "শুনিয়াছি আপনি আদালতে কাহাকেও ৵০ আনা পয়সাও ছাড়িয়া দেন না। আর এই ভিক্ষুক, ব্রাহ্মণ কি না কে জানে, কন্যাদায় কি না কে জানে, ইহাকে বিনাবিচারে দুই টাকা দিলেন; এ কি নীতি?" তিনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "সেখানে চাকরি, এখানে ত চাকরি নয়। ব্রাহ্মণ মিথ্যা বলিয়া থাকেন, তাহাঁর পাপ; তা বলিয়া আমি কন্যাদায়ে যথাসাধ্য দান না করিয়া থাকিতে পারি কি?" আর একটি শোন। এক মালী বৃদ্ধ হইয়াছিল, কথায় কথায় স্মরণ করিত, তিন-কুড়ি সাত বৎসর পার হইয়াছে, এখন প্রভুর ইচ্ছা। কাজ-আরম্ভে জগন্নাথ, মাঝে জগন্নাথ, শেষে জগন্নাথ, নাম উচ্চারণ করিত। পাড়ার শঠেরা তাহার ধর্মভাব দেখিয়া কখনও কলা, কখনও মূলা, কখনও শাগ, কখনও পাতা এমন লইত যে যাহাঁর বাগান তাহাঁর ভোগে আসিত না। মালী বলিত, লোকের দরকারে যদি কিছুই

করিতে না পারি, তাহা হইলে তিন-কুড়ি সাত বৎসর বাঁচিয়া ফল কি?

প্রমথ॥ এসব ভণ্ডামি, গোরু মেরে জুতা দান।

গণেশ॥ কিন্তু, বল ত, যাহাঁদিগের চরিত দেখিয়া গ্রাম্য জন নিজের চরিত সংশোধন করিবে, তাহাঁরা গোরু মেরে জুতা দান করিলে কোন্ নীতির প্রচার হইবে? duty honorary বলিয়া অবহেলা করা কোন্ নীতি? যেখানে সাক্ষাৎ ধর্ম, যাহার নাম ধর্মাধিকরণ, সেখানে কি না হইতেছে? পুত্রকন্যাকে, জনসাধারণকে অসত্যের মাঝে বসাইয়া বলিতেছে, "সদা সত্য কথা কহিবে!" শিক্ষা-কল কত টিপিবে? রামায়ণ-মহাভারত কত ছাপাইবে? মানুষ ধর্মাধর্ম-সংযুক্ত; এক কাজে ধার্মিক, অন্য কাজে অধার্মিক; তথাপি বাল্যকাল হইতে ধর্মের (right conduct, duty) দিকে, ধর্মকর্মের দিকে, মতি চালিত করিতে পারিলে ধর্মেকর্মে অভ্যাস জন্মাইতে পারিলে, ব্যবহারের সময় বিচার করিতে হইবে না। ধর্ম-উপদেশে যত না হউক, ধর্মআচরণে একটা সৎ অভ্যাস দাঁড়াইয়া যায়। পুত্রকন্যা প্রাতে মাতাপিতা, অপর গুরুজন ও ঠাকুর প্রণাম করিবে; তাহাঁরা আশীর্বাদ করিবেন। শুধু এইটুকুর অভ্যাস জন্মাইয়া দাও, দেখিবে ধর্মের পোত পড়িয়াছে।

প্রমথ॥ গুরুজনকে প্রণাম করিতে পারে, কারণ তাহাঁরা লালন-পালন করেন। কিন্তু ঠাকুর-পূজা করিবে?

গণেশ॥ এইখানে দেশী ও বিদেশী ধর্মের বিস্তীর্ণ প্রভেদ। মাতাপিতা লালন-পালন করেন, কিংবা ঠাকুর আশীর্বাদ করিবেন ভাবিয়া আমরা মাতাপিতা ও ঠাকুর-দেবতার পূজা করি না। আমাদের ধর্ম এই, আমরা পূজা করি। কেন এমন ধর্ম, সে অনেক কথা। সে কারণে আমরা গোকে ভগবতী জ্ঞান করি, ভূমিকে ধাত্রী মনে করি। সে কারণে কেহ সরস্বতী, কেহ লক্ষ্মী, কেহ দুর্গা, কেহ শিব, কেহ কৃষ্ণ, কেহ শালগ্রাম, কেহ বা বিশ্বকর্মার পূজা করি। মানুষের যে আশ্রয় ছিল, তাহা নষ্ট হইতেছে; হিংসা, অসত্য, অসূয়া, নৃশংসত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। যে নামই কর, একটা শরণ্য রাখ। এই শিক্ষা বাল্যকাল হইতে না দিলে পরে সংশয়ে জীবন কাটাইতে হইবে। তবে, যিনি কাল, যিনি শিব, যিনি শঙ্কর, যিনি যোগ (combination of events) দ্বারা জগতের ক্ষেম (well-being) সিদ্ধ করিতেছেন, তিনি

নিদ্রিত নাই। তাহাঁর কর্ম তিনি করিতেছেন। আমরা কর্মের সহিত ধর্মের-এবং ধর্মের সহিত কর্মের যোগ ঘটাইতে চেষ্টা করি। পারিব কি না, তিনিই জানেন। "কেন এই কর্ম করিতেছ?"—উত্তর হইবে, কারণ ধর্মই বড়। "কেন এই ধর্ম করিতেছ?" কারণ কর্মই বড়। এখনও এদেশ ধর্মহীন হয় নাই। দেখ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময় অন্য দেশে অধর্মের অত্যাচার যত হয়, এদেশে তত হয় না। বছরে বছরে যত বই ছাপা হয়, বোধ হয় তাহার চৌদ্দ আনা ধর্মগ্রন্থ। দেশ-কাল-পাত্র উপেক্ষা করিয়া যে শিক্ষাই দাও, সেটা কুশিক্ষা হইবে। আমাদের দেশের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা কোন্ দেশে আছে? কোন্ গুণে এত ধৈর্য?

প্রমথ॥ ধৈর্য একটু কম হইলে ভাল ছিল। অনাবৃষ্টিতে মাঠের ধান শুখাইয়া যাইতেছে, পুকুরের জল খোলায় করিয়া সেঁচিতেছে! একটা কাঠ কুঁদিতে হইবে; একজন টানিবে, আর একজন থামিয়া থামিয়া কুঁদিবে! ধন্য ধৈর্য!

গণেশ॥ তুমি হইলে কি করিতে?

প্রমথ॥ কেন, 'পম্প' বসাইয়া হড়্-হড়্ করিয়া জল তুলিয়া পাঁচ দিনের কাজ একদিনে শেষ করিতাম। একটা 'লেদ' (lathe) দিয়া কাঠখানা একাই কুঁদিয়া ফেলিতাম। একটু উদ্যম (enterprise) থাকিলে কি না হইত।

গণেশ॥ তুমি 'পম্প' ও 'লেদ' দেখিয়াছ, তাহাদের নিন্দা করিতেছ। তাহারা কখনও দেখিয়াছে কি, কিংবা তাহাদের কিনিবার পয়সা আছে কি? দেখে নাই বলিয়াই ত দেখাইতে বলিতেছি। তুমি বিদ্যা শিখিয়াছ, দেশের লোককে একটু দান করিতে বলিতেছি। কিন্তু খোলায় করিয়া জল তুলিতে দেখিয়াও কি বলিতে পার উদ্যম নাই? কোন্ উদ্যমে শুখ্‌না মাটিতে ধার-করা ধান বুনিয়া দেয়, কোন উদ্যমে ক্ষেতে গিয়া রোদে বর্ষায় দিনের পর দিন খাটে? এত দেখিয়াও বল, উদ্যম নাই? তোমার উদ্যমে অনিশ্চয় অল্প; আটঘাট ভাবিয়া উদ্যম। আর ইহাদের উদ্যমে সবই অনিশ্চয়। বর্ষা, যথাসময়ে বর্ষা হইতে পারে, নাও হইতে পারে; ঝড় হইতে পারে, পোকা লাগিতে পারে। এত অনিশ্চয়ের মধ্যে যে বুক বাঁধিয়া কাজ করে, তাহাকে উদ্যম-হীন বলিতে পার কি?

প্রমথ॥ এমন উদ্যম আছে। কিন্তু পুরাতনকে এমন ধরিয়াছে যে,

নূতনের নামে শিহরিয়া উঠে। নূতন কিছু করিতে বলা যাক, অমনই পিছাইয়া পড়িবে।

গণেশ॥ পুরাতন নিশ্চিত, নূতন যে সব অনিশ্চিত। নূতন লইয়া তুমি খেলা করিতে পার; তোমার কিছুই আসে যায় না। তাহারা খেলা করিতে পারে কি? যে ধানের আশায়, তাহার একার নহে, তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার প্রাণ নির্ভর করিতেছে, সে ধান লইয়া সে খেলা করিতে পারে কি? তুমি বলিতেছ, জমিতে হাড়-গুঁড়া ছড়াও। তুমি তাহার ভালর তরে বলিতেছ। কিন্তু হাড়-গুঁড়ায় যদি ধান মরিয়া যায়, যত ফলিবার তত যদি না ফলে? তখন তুমি তাহার ক্ষতি-পূরণ করিবে কি? তাহার পাশের জমিতে হাড় গুঁড়া ছড়াইয়া দুই-তিন বছর দেখাও, কেমন বেশী ধান হয়; তখন তাহাকে আর বলিতে হইবে না, তাহাকে পুরাতনের ভক্ত বলিয়া গালি দিতে হইবে না। তখন দেখিবে, সে তোমার উপরে উঠিয়াছে, তুমি যাহা পার নাই সে পারিয়াছে। কারণ, তোমার মাত্র সদিচ্ছা, আর তাহার মরণ-বাঁচনের কথা। তুমি এত জান, এত লেখা-পড়া শিখিয়াছ, এই সামান্য কথাটায় অধীর হইয়া পড়িতেছ! বলিতেছ এদেশের লোকগুলা এত নির্বোধ, নিজের স্বার্থও বুঝিতে পারে না! দেখ, সকল বিষয়েই তিন অবস্থা আছে, ক্ষয় (decline), স্থিতি (stationary condition) আর বৃদ্ধি (growth or rise)। আমাদের দেশের কৃষকেরা বৃদ্ধি করিতে না পারুক, ক্ষয় করিতেছে না। যে জ্ঞান ছিল, বরং তাহা বাড়াইয়াছে, কমায় নাই। সে সময় তুমি উপদেষ্টা ছিলে না। আমরা উদ্যমহীন, আমরা পুরাতন-প্রিয়, এই দুই অপবাদে অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। কেবল কৃষিতে নহে, আমরা যখনই কিছু না করি, তখনই এই দুই অপবাদের বোঝা মাথায় চাপাইয়া ঢাক-ঢোল পেটা হয়।

প্রমথ॥ এ যেন হ'ল; চাষের সঙ্গে ধর্মের কি সম্বন্ধ? তাঁতী তাঁত বুনিতেছে, ছুতার কাঠ চিরিতেছে, কামার লোহা পিটিতেছে, ধর্ম কোথায়?

গণেশ॥ তাহারা কার কর্ম করিতেছে? "তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে আমি করি"—এই গান কেবল বঙ্গদেশের গ্রামে নয়, ভারতবর্ষের যেখানে যত গ্রাম আছে, সব গ্রামের লোক শুনিয়াছে। বেদে কোরাণে বাইবেলে সব শাস্ত্রেই লেখা আছে। ক্ষেতে কৃষক লাঙ্গল

করিতেছে, কার তরে করিতেছে? নিজের তরে? সেই যে দেবী যিনি সর্বভূতে বিষ্ণুমায়া, দয়া, তুষ্টি, বৃত্তি, মাতৃ রূপে সংস্থিতা হইয়া জগৎ-যন্ত্র ঘূর্ণিত করিতেছেন, তিনিই জানেন। এই উক্তি হিন্দু কি, মুসলমান কি, শোনে নাই?

প্রমথ॥ যদি শুনিয়া থাকে, তবে আবার শোনাইয়া ফল কি?

গণেশ॥ শোনে, কিন্তু ভুলিয়া যায়। সেই পুরানা গানই কর্মে প্রয়োগ করিতে বল, নিরানন্দ স্থানে আনন্দ আসিবে। এখন কর্মের প্রবর্তক, আমি ও আমার। তখন মনে হইবে, আমি না করিলে কে করিবে? এখন পুরানা পুকুরের পাঁক উঠিতেছে না। তখন দেখিবে নূতন দীঘি কাটা হইতেছে। এই যে ভুবনেশ্বরের মনোহর মন্দির; কোন্ শিল্পী মন ঢালিয়া গড়িয়া গিয়াছে! সে কে, তাহার নামধাম সন-তারিখ কোথাও ক্ষোদা আছে কি? সাধ্য কি, সে নিজের নাম ক্ষুদিবে। মনে কর কি, পয়সা দিয়া নির্মিত হইয়াছিল? প্রবল রাজার বেত্রাঘাতে পাথর উঠিয়াছিল? পুরীতে নাকি ৫২ মঠ (সে কালের residential college) আছে; কত দেশ-দেশান্তরের কে বিষয় সম্পত্তি দিয়া গিয়াছে, তাহাদের নাম-ধাম কোথায়? যশের তাড়নায় মঠ স্থাপন করিলে পাথরে পাথরে নাম লেখা দেখিতে, পাথরে পাথরে প্রতিমূর্তিও দেখিতে পাইতে।

প্রমথ॥ এখন দেখি পাঁচশত টাকা দান করিলে পাথরে নাম ক্ষুদিতে একশত টাকা খরচ হয়। আগে নাকি জয়ঢাক অপরে বাজাইত, এখন নিজের ঢাক নিজে বাজাইতেছে। সে মতি গেল কেন?

গণেশ॥ কাল মতি দিয়াছিলেন, কাল সংহার করিয়াছেন। আবার নিশ্চয়ই অন্য আকারে দিবেন। কি সে আকার, আমরা চিনিতে পারিতেছি না। বোধ হয়, সেকালের লোকেও চিনিতে পারিত না। রহস্য এই, যে কিছু দেয়, সে জানে না। যে কিছু নেয়, সেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। তোমার পুষ্করিণীর জল আমি খাইলে তোমার পুণ্য, আমার কিছু নহে; তোমার বাড়ীতে অতিথি আসিলে তুমি ভাগ্যবান্, অতিথির কি। এই কারণে তুমি পাদ্য অর্ঘ্য আসন দিয়া অতিথির পূজা করিবে; অতিথির পরিতোষে তোমার পরিতোষ। ইহাতে বাধ্যবাধকতা কি আছে। গৃহস্থ স্বকর্ম দ্বারা জীবিকা সংগ্রহ করিয়া দেব, পিতৃ, অতিথি, ভৃত্যকে দিয়া যাহা থাকিত, তাহা মাত্র ভোগ করিত।

প্রমথ॥ সেদিন আর আসিবে না। এখন পুরাতনের উদাহরণ দিয়া লোক-শিক্ষার চেষ্টা বৃথা।

গণেশ॥ একবারে বৃথা নহে; উত্তম যেখানে পাইবে, তাহাই গ্রহণ করিবে, লোককে শোনাইবে। কেবল এদেশের নহে, পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু পাইবে, তোমার দেশের ধর্মানুমোদিত হইলে বলিবে, দেখাইবার হইলে দেখাইবে। তথাপি দেশের উদাহরণ অধিক লইবে, কারণ লোকে সহজে গ্রহণ করিতে পারিবে। লোককে তুলনা করিতে দিবে। তুলনা করিতে করিতে লোকেও গ্রহণ করিবে। শ্রোতা নিরক্ষর হইতে পারে কিন্তু নির্বোধ নয়। অসম্ভব কিছু বলিবে না, সত্যের বাহিরে যাইবে না, নিন্দা করিবে না, বাহুল্য করিবে না। মনে কর, এক গ্রামে এক সামান্য গৃহস্থের বাড়ী আছে। ছোট, কিন্তু পরিষ্কার ঝর্-ঝরা। উঠানটি ছোট, কিন্তু তাহারই এক পাশে তুলসী গাছ ও অন্য দুই একটা ফুলগাছ আছে; আঁস্তাকুড় বাহিরে এমন স্থানে আছে, যেখান হইতে গন্ধ আসে না। আঁস্তাকুড়ও পরিষ্কার। বাড়ীর পাশের পুকুরটি ছোট, একটা ডোবা বলিলেই হয়। ডোবাটি হয় ত তাহারও নয়, কিন্তু সে নিজের ভাবিয়া জল নির্মল রাখিয়াছে, গাছ-পালা জন্মিলে নিজে পরিষ্কার করে। ডোবাটি হয় ত তাহার; জল কেমন তক্-তক করিতেছে! ডোবার পাড়ে দুই এক ঝাড় কলা-গাছ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু সেখানেও পরিষ্কার; শুখনা পাতা ছিঁড়িয়া ঝুলিয়া অসুন্দর হয় নাই। লক্ষ্মীবার (বৃহস্পতিবার) কি না, ঘর-দুয়ার উঠান সব নিকান হইয়াছে, আলিপনা পড়িয়াছে। বাড়ীখানি দেখিলেই মনে হয় লক্ষ্মী বাস্তবিক আছেন। অথচ যৎসামান্য গৃহস্থ, হয় ত দিন খাটিয়া দিন খায়। অন্য গ্রামের আর এক গৃহস্থের বাড়ী দেখ। নিকটে যাইতেও ইচ্ছা হইতেছে না। প্রত্যহ এক টাকা উপার্জন করে, কিন্তু চালের খড় উড়িতেছে। পরণের কাপড়খানা ময়লা, ঘর-দ্বারে ঝাঁটও পড়ে নাই। এখানে কাঁথ ভাঙ্গা, ওখানে ইন্দুরমাটি। দেখিলেই লক্ষ্মীছাড়া মনে হয়। লোককে এই দুই বাড়ীর ছায়া-চিত্র দেখাও। তাহারা আপনা-আপনি শৌচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে। এই জ্ঞান পাঁচখানা বই পড়াইয়া দিতে পারিতে না। প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ও পঠিত-জ্ঞানে এত প্রভেদ।

প্রমথ॥ বাড়ীতে ফুলবাগান করিবে, আলিপনা দিবে?

গণেশ ॥ নিশ্চয়। সৌন্দর্য-জ্ঞানের সহিত পবিত্রতা জড়িত। বাড়ীখানি সুন্দর করিবার প্রয়াসেই মনও সুন্দর হইয়া পড়ে। যে বাড়ীতে তুলসী গাছ আছে, ফুলগাছ আছে, সেখানে লক্ষ্মী আবির্ভূতা হন। সেখানে দেবভাব ও শান্তিরস মিশ্রিত হইয়াছে। জানিবে, গৃহস্থ বেলাফুলের মালা গাঁথিয়া নিজে গলায় পরে না, ঠাকুরকে নিবেদন করে। যদি বা পরে, আগে ঠাকুরকে দিয়া, পরে। যে কৃষক লক্ষ্মী ভাবিয়া বীজ রাখে, সে নিশ্চয়ই বীজ বাছিয়া রাখে। ক্ষেতে লক্ষ্মীও ফলেন। এইরূপ, সকলেই কত জানে, জানেও না, ভুলিয়া যায়। তাহাদের কানের কাছে পুনঃ পুনঃ মন্ত্র আওড়াইয়া, সিদ্ধি দেখাইয়া, সংশয় দূর কর। সংশয় থাকিতে বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা হয় না, কর্ম আসে না।

প্রমথ ॥ সময়ে সময়ে কৃষি-প্রদর্শনী হইয়া থাকে। একবার দেখিয়াছি, একজন খুব বড় এক কাঁদি কলা দিয়াছিল, পুরস্কার পাইয়াছিল। যখন যেখানে মেলা বসে, তখন সেখানে এইরূপ প্রদর্শনী করিলে দেশের শিক্ষা হইতে পারে।

গণেশ ॥ মেলাতে অনেক লোক জড় হয়, কিন্তু চিত্তও বিক্ষিপ্ত হয়। কলা-কাঁদি দেখিয়া যদি পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে অপকার করা হইয়াছে। বুদ্ধি ও যত্ন, অর্থাৎ মানুষের চেষ্টার পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু যে কাঁদি আপনি বড় হইয়াছিল, তাহাতে মানুষের কৃতিত্ব কোথায়? আমি হইলে মাটি ও কলার চারাকে পুরস্কার দিতাম।

প্রমথ। ॥ অপকার করা হইয়াছে?

গণেশ ॥ হাঁ। সে এবং অন্যে বুঝিয়াছে, মানুষের হাত নাই, দৈবই বলবান্। দৈবে কি হইতে পারে, তাহা প্রদর্শনের উদ্দেশ্য হইলে কিছু ফল হইয়াছে। কিন্তু সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাধন বুঝাইয়া না দিলে সিদ্ধিটা শোনা কথায় দাঁড়ায়। এত বড় কাঁদি হইতে পারে, এরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন আছে; কিন্তু যখনই মনে হইবে, দৈবে হইয়াছে, তখনই চেষ্টা অদৃশ্য হইবে। দৈব হইতে যে জ্ঞান লব্ধ হয়, তাহার প্রয়োগের সামর্থ্য কৃষকের নাই।

প্রমথ ॥ কলাজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী করা যাইতে পারে; তাহাতে দেশের কোথায় কি দ্রব্য কেমন হইতেছে, তাহার জ্ঞান সহজে পাওয়া যাইবে।

গণেশ॥ সেই কথা বলিতেছি। প্রভেদ এই, তোমাকে সে সব দ্রব্য গ্রামে গ্রামে প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতে হইবে। লোকে দেখিয়া কিনিবে, এ কারণ নয়; লোকে দেখিয়া জানিবে। অনেক বিষয়ে আমাদের রুচি পরিবর্তিত হইয়াছে, কারু জানে না। তাহাকে এই নূতন রুচি দেখাও। কলার নিমিত্ত উপকরণ (materials), করণ (implements or tools), জ্ঞান, এবং অর্থ, এই চারি চাই। চাকরিতে এক জ্ঞান সম্বল করিয়া চলিতে পারা যায়। এইরূপ, ওকালতি, ডাক্তারী, মাষ্টারী প্রভৃতি রূপ সেবায় সেবা-জ্ঞান থাকিলেই চলে। বাণিজ্যে উপকরণ বা পণ্য এবং জ্ঞান, এই দুই চাই। গবাদি পশুপালনে করণ ব্যতীত অপর তিন চাই। কৃষি ও কলায়, চারি-ই চাই। আমরা কৃষকের নিকট উত্তম বীজ, উত্তম ফল, উত্তম করণ, উত্তম জ্ঞান কিছু কিছু ধরিতে পারি। কারুর নিকট উত্তম উপকরণ, উত্তম করণ, উত্তম পণ্য, উত্তম জ্ঞানও ধরিতে পারি। উত্তম যন্ত্রের অভাবে কত কারু যে কত সময় ক্ষেপ করে, তাহা দেখিয়া থাকিবে। সে যন্ত্র, সব যে বহুমূল্য এমন নয়। যন্ত্রের বাহুল্য দেখাইবে না; দেখাইলে আমাদের কারু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিবে। বাছিয়া বাছিয়া দেখাইবে। এইরূপ, বাছিতে পারিলে তোমাকে বহু দ্রব্য বহিয়া বেড়াইতে হইবে না।

প্রমথ॥ বিনা অর্থে কিছুই হইতে পারে না।

গণেশ॥ বিনা অর্থে ধর্ম ও কাম, কোনটা হইতে পারে না। দুঃখী দরিদ্রের পক্ষে দান সাধ্য নয়। কিন্তু এমন ধর্মও আছে, যাহা ধনী পারে, নির্ধনও পারে। কাম অর্থে যাহা অভিলাষ করি (object of desire)। অতএব কৃষি কিংবা কলা অর্থ বিনা হইতে পারে না, আমরা দিতেও পারি না। কিন্তু এমন এক জ্ঞান দিতে পারি, যাহাতে অর্থ আসিতে পারে। ভারতবর্ষে এমন নগর নাই, যেখানে মারোআড়ী বণিক নাই। কেমন করিয়া মারোআড়ী বাণিজ্য শেখে, ও একজন হইতে ক্রমে ক্রমে দশজন আসিয়া জোটে, তাহা দেখিয়াছ কি? পরিপণ (stock) নাই, কিন্তু পণ্য বেচে। সহকারিতায় (co-operation) অনেক হয়। দুর্বলের পক্ষে সহকারিতা এক বল। একথা এদেশে নূতন নয়। নূতন হইলে প্রচলন কঠিন হইত। কৃষিতে গ্রন্থি (clubbing) অদ্যাপি গাঁতা নামে খ্যাত। গাঁতা করিয়া চাষ গ্রামে গ্রামে দেখিতে পাইবে। কাহারও গোরু আছে, কাহারও

লাঙ্গল আছে, কাহারও বীজ আছে, কাহারও মুনিষ আছে। একজনের অভাব অন্য দ্বারা পূরণ হয়। এইরূপ, পূর্বকালে কারু (artisan) -দিগের 'শ্রেণী' (trade guilds) ছিল। তাহারা 'নিক্ষেপ' (deposit) রাখিত এবং বিপত্তিকালে সেই 'নিক্ষেপ' প্রয়োজনমত গ্রহণ করিত। অদ্যাপি অনেক কারু ও বণিক স্থানে 'বৃত্তি' নামে কিছু কিছু টাকা 'নিক্ষেপ' করা হয়। কিন্তু শেষে বারোআরীতে সে টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু সমস্ত টাকা বারোআরীতে ব্যয় না করিয়া এবং বৎসরের আয়ের কিয়দংশ 'নিক্ষেপ' করিয়া প্রত্যেক 'শ্রেণী'র 'নীবি' বা মূলধন (capital) বাড়াইতে পারা যায়। এই যে "সমবায় উদ্ধার সমিতি" (co-operative credit society) স্থাপিত হইয়াছে, তাহা হইতে বহু প্রত্যাশা করিতেছি। এই সকল সমিতিতে বিচক্ষণ সৎ দেশজ্ঞ মুখ্য নিযুক্ত হইলে দেশের কৃষি ও কলার বিশেষ উপকার হইবে। সবই এই সকল মুখ্যের উপর নির্ভর। কৃষক ও কারুর লভ্যের যতখানি গড়ে দালাল, আড়ৎদার, ব্যাপারী প্রভৃতি মধ্যপুরুষের (middle man) উদরে যাইতেছে, তাহারা পাইলে বাঁচিয়া যাইত। কৃষক ক্ষেতে প্রচুর আলু জন্মাইয়াছে, যথা সময়ের পূর্বেই জন্মাইয়াছে; কিন্তু কাহাকে কোথায় বিক্রী করিবে? তাঁতী দিন-রাত খাটিয়া প্রত্যহ একখানা ধুতি বুনিতেছে; কিন্তু কে তৎক্ষণাৎ কিনিয়া দাম দিবে? এখন 'মহাজন'কে বেচিতে হইতেছে। কিন্তু মহাজন আর একজনকে বেচে, সে আর একজনকে। এইরূপে তিন চারি হাত ঘুরিয়া গ্রাহকের হাতে যায়। ধুতির দাম অল্পে অল্পে বাড়িয়া উঠে। গ্রাহক দাম দেয়; কিন্তু সমুদয়, কারু যে তাঁতী, সে পায় না। অথচ সে পাইলে বাঁচিয়া যাইত!

প্রমথ॥ মহাজনই দেশের সর্বনাশ করিতেছে।

গণেশ॥ এক নিশ্বাসে 'রায়' প্রকাশ করিও না। মহাজন ভাল আছে, মন্দ আছে; সুজন আছে, দুর্জন আছে। কিন্তু কোন্ ব্যবসায়ে দুর্জন নাই? বিদ্বান্, উত্তম শিক্ষিতদিগের মধ্যে দুর্জন নাই?

প্রমথ॥ আমি শুদখোর মহাজনের কথা বলিতেছি। টাকায় এক আনা শুদ কষিয়া কষিয়া খাতকের রক্ত শুষিয়া খায়।

গণেশ॥ যদি টাকায় বছরে ৮০ আনা বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে গ্রামের সবাই মহাজনি করে না কেন? এত লভ্য ত আর কিছুতে নাই। কিন্তু মহাজনের কত টাকা ডুবিয়া যায়, তাহার হিসাব

দেখিয়াছ কি? খাতক টাকায় এক আনা শুদ দিতে স্বীকার, যখনই শুনিবে, তখনই জানিবে সে খাতককে তোমরা এক পয়সাও ধার দিতে না। কোনও 'বেঙ্ক' দিত না, নিশ্চয়। "সমবায়-উদ্ধার-সমিতি"ও দিত না। এমন খাতকের বিপত্তির সময় যে মহাজন টাকা দেয়, সে মহৎ জনই বটে। শুদ কেন চড়া, তা না ভাবিয়া উপকারী মহাজনের দোষ দিলে অধর্ম হইবে। দোষটা দেশের; দেশটা এত দরিদ্র যে এক আনা শুদ দিতে হয়। মহাজন শব্দের প্রাচীন অর্থ কি, জান? বহুজন,—মহাজন (a multitude of men)। এই বহুজনের মধ্যে যে প্রধান হইত, ব্যবসায়ে বড় হইত, সে ক্রমে মহাজন নাম পাইত। বোধ হয়, প্রথমে 'শ্রেণী' ছিল; সেই শ্রেণীর যে প্রধান, সে মহাজন। অতএব কৃষক ধর, কি কারু 'শ্রেণী' ধর, মহাজন তাহাদেরই একজন, এক প্রতিনিধি। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে তাহাদেরই। ধর্মদাসের ঘরের চাল ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে; বর্ষাকালে বেচারীর দাঁড়াইবার স্থান নাই। অর্থ সঞ্চয় দূরে থাক, যাহা প্রত্যহ আনে, তাহাতে খাইতেও কুলায় না। মহাজনের দ্বার ভিন্ন তাহার কি গতি আছে? এমন লোককে মহাজন বাঁচাইতে পারে; কারণ টাকা তাহার একার। সমিতি পারে না, কারণ সমিতির টাকা দশজনের। শ্রেণীর মহাজন শ্রেণীর প্রত্যেককে বাঁচাইতে পারে। আমাদের দেশের জাতিবন্ধনের মূল এই শ্রেণী। পরস্পরের হিতসাধনই উদ্দেশ্য। জাতিবিভাগের অন্য কারণ যাহাই থাক, বন্ধনের কারণ সমবায়ে (Combination) হিতেচ্ছা। এখন মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়াছি। পুরাতন শ্রেণীর ভাব জাগাইতে পারিলে কৃষক ও কারুর অর্থাভাব কিছু কমিতে পারে। মনে করিও না, সমাজভেদ উঠাইয়া দিতে পারিবে। সেই ভেদ অন্য নামে—সমাজ, সভা, সমিতি প্রভৃতি নামে থাকিবেই থাকিবে। সমবায়ে বল-সংগ্রহ, সকলেরই উদ্দেশ্য।

প্রমথ॥ আমাদের দেশের লোকগুলাও নির্বোধ; আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করে, শেষে মহাজনের দ্বারস্থ হয়।

গণেশ॥ দেখ, আর যাহা বল, অতিব্যয়ী বলিও না। অকস্মাৎ বিপদ না ঘটিলে কেহ অন্যের নিকট ঋণী হয় না। অর্থ সঞ্চয় করিবার পর বিবাহ করা চলে; কিন্তু সে নীতি পিতৃদায়, মাতৃদায়, কন্যাদায় মানে না। 'দায়' অর্থে দান (gift)—পিতামাতার শ্রাদ্ধে দান করিতেই হইবে। যাহার যেমন সমাজ, তাহাকে সে সমাজের

তেমন মর্যাদা (propriety of conduct) রক্ষা করিতে হয়। গ্রামে দেখিবে, অবস্থা বিবেচনা করিয়া সমাজই মর্যাদা স্থির করিয়া দেয়। একজন শত্রু হইতে পারে, পাঁচজনই পারে না। পাঁচজনে বসিয়া কর্তব্য স্থির করিয়া দেয়, যথাসাধ্য সাহায্যও করে। আর, কন্যাদায় যাহা বলিতেছ, তাহা কতকটা তোমাদের সৃষ্টি। তোমরা কত নূতন নূতন সৃষ্টি করিতেছ, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? সাধারণ লোকে তোমাদিগকে আদর্শ জ্ঞান করে; কারণ তোমরা বিদ্বান্ ও সমাজের হিতাহিত বিবেচক। কিন্তু তোমরা যাহা পার না, তাহারা পারে। একবার এক গ্রামের প্রায় পঞ্চাশঘর দোলিয়া (দোলাবাহী) একদিনে মদ্য ত্যাগ করিয়াছিল, অদ্যাবধি স্পর্শ করে নাই। কর্ম-সামর্থ্যই পুরুষ-সামর্থ্য। গর্হিত বুঝাইয়া দিলে তাহারা মানে। তোমরা মান কি? তোমরা স্বাধীন-চিন্তা চাও; কিন্তু চিন্তাকে স্ব-এর অধীন রাখিয়াছ কি? লোকশিক্ষা স্বাধীন-চিন্তায় চলিবে না! যাহা আছে, তাহার উপর ভিৎ তুলিতে হইবে। গড়িতে না পারিলে ভাঙিবে না। দেশটি কি রকম হইলে সন্তুষ্ট হইতে পারিবে, তাহা মনে মনে, আদি-অন্ত, শাখা-প্রশাখা -সহিত, শিল্পীর ন্যায় রচনা করিবে। বৈষম্যে যতই কষ্ট বোধ কর, দূর করিতে পারিবে না; কারণ বৈষম্যেই সৃষ্টি। সাম্য একটা অসম্ভব কল্পনা। অতএব দেশের কর্মের অনুবন্ধ (motive) ধ্যান করিবে, বিরোধ ভাঙিতে চেষ্টা করিবে, তারপর লোক শিখাইতে বাহির হইবে। কারণ শিক্ষা দ্বারা কেবল বুদ্ধির উৎকর্ষ নহে, প্রজ্ঞাবৃদ্ধি হইবে। যিনি কর্ম ও জ্ঞান যোগ করিয়া শিখাইতে পারেন, তিনিই সাধক, তিনি ধন্য, তাহাঁর ভক্তও ধন্য। পুরাতন সবই পবিত্র নহে, নূতন সবই নিন্দিত নহে। যেমন শিখাইবে, সমাজ তেমন হইবে। শিক্ষার শিকড় সমাজের উপর হইতে নিম্নতলে গিয়া ঠেকে।

প্রমথ॥ এমনি সব দেখাইয়া দেখাইয়া বলিয়া বলিয়া বেড়াইলে দেশের শিক্ষা হইবে?

গণেশ॥ এমনি কি? শিখাইবার অন্ত আছে কি? মনে কর, এক গ্রামে গিয়া আমাদের তীর্থ-স্থান কহিতে গিয়াছ। গ্রামের লোক যত মূর্খ হউক, যে বার্তাই করুক, কতকগুলা নাম নিশ্চয় শুনিয়াছে। ছায়া-পটে ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখাও, কোথায় কি তীর্থ, সে তীর্থে কি ঠাকুর, কেমন মন্দির, সে দেশের লোক কেমন, তাহাদের কাপড়-

চোপড় কেমন, ঘরকন্না কেমন, সেখানে যাইবার পথ কি, ইত্যাদি ইত্যাদি ধরিয়া একটা নূতন পৃথিবী, তোমার শ্রোতার পৃথিবী অপেক্ষা হাজার কি লক্ষ গুণে বৃহৎ পৃথিবী, চোখের সামনে ধরিবে। তীর্থের কাহিনী কয়দিনে শেষ করিতে পারিবে? আর, কত বিষয় কত অল্প সময়ে জানাইতে পারিবে? দেশ-জ্ঞান জন্মাইবার এমন সহজ উপায় কোথায় পাইবে? রামায়ণী কথা ধর। এই এক কথা ধরিয়া দিনের পর দিন কত কথা বলিতে পারিবে; চিত্র দ্বারা বাস্তব করিবে; কোথায় অযোধ্যা, কোথায় সরযূ, কোথায় মিথিলা, কোথায় দণ্ডকারণ্য, কোথায় লঙ্কা প্রভৃতি দেখাইতে দেখাইতে দশরথের সত্যপালন, রামের পিতৃভক্তি, ভরত ও লক্ষ্মণের সৌভ্রাত্র, সীতার পাতিব্রত্য প্রভৃতি ধর্ম জীবন্ত হইয়া উঠিবে। একালের ডাকঘর ধর। কি বিশাল ব্যবস্থা, পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ, এক করিয়া ফেলিয়াছে; দুইটি কি চারিটি পয়সার বদলে দূর-দূরান্তরের বন্ধুর সংবাদ আনিয়া দিতেছে!

প্রমথ॥ এমন সব ধরিলে কথকতা অফুরন্ত বটে। একখানি কাপড় ধরিয়া আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত দিয়া গেলে শত বিষয়ের জ্ঞানসঞ্চার করিতে পারা যায়। কিন্তু শুধু জ্ঞানে কি হইবে, কর্ম চাই। সম্প্রতি যে "গৃহশিল্প-সমিতি" স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে অনেক কর্ম হইতে পারিবে।

গণেশ॥ কর্ম হউক না হউক, যেটা যা নয় সেটাকে তা বলিও না। কারণ আসলটা Home Industry। Home মানে স্বদেশ এবং Industry মানে ব্যবসায় বুঝি। বহুলোক কোনও উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিলেই Industry। ইংরেজীতে কৃষিও একটা Industry। কৃষিকর্মকে "গৃহ-শিল্প", "কুটীর-শিল্প" বলিতে শুনিলে হা-হতোস্মি করিতে ইচ্ছা হয়। "গৃহ-শিল্প", "কুটীর-শিল্প" বলিলে বুঝি গৃহনির্মাণ-শিল্প (art of building)। ময়দানব শিল্পী ছিলেন, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-সভা নির্মাণ করিয়াছিলেন। বিশ্বকর্মা দেবতাদিগের শিল্পী। এ কারণ দেশের কারু বিশ্বকর্মার পূজা করে; যেন তাহার কলায় নূতন নূতন 'অভিপ্রায়' (design) ব্যক্ত হয়। 'স্বচিত্ত-কারু',—যে কারু নিজের মন হইতে গড়ে, সে শিল্পী। যে নিজের মন হইতে

গড়ে না, সে কারু (artisan) মাত্র। শিল্পী, কারু-শ্রেষ্ঠ (master artisan) বরং স্রষ্টা (master artist)।

প্রমথ॥ নামে কি আসে? কথাটা বুঝিলেই হইল।

গণেশ॥ নামে খুব আসে যায়। জ্যোৎস্নায় গাছের ডালের ছায়া পড়িয়াছে। ভূত-প্রেত নাম শুনিলে ভয় জন্মিবে, ডালের ছায়া শুনিলে জন্মিবে না। একটা নামের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা ইতিহাস মনে আসে। Technical education=কলা-শিক্ষা। কলা-শিক্ষা বল, দেশের হাজার হাজার কলার সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। তখন মনে হইবে, অদ্ভুত কিছুর শিক্ষা নয়। যদি নূতন কিছু হয়, যেটা এদেশে নাই. তখন 'বিলাতী কলাশিক্ষা' বল, কলা স্পষ্ট হইয়া পড়িবে। পাঠ-শালা নাম ছাড়িয়া 'বিদ্যালয়' বল; মনে হইবে একটা কিছু নূতন। তখন দেশের সঙ্গে মিশিতে সময় লাগিবে। যাহা কিছু আমরা শ্রেয় বলিয়া বিদেশ হইতে গ্রহণ করিব, সে সব যত দেশী করিয়া ফেলিবে, ততই সুবিধা। কুটীরশিল্প বলিলে এই অর্থ আসে না। দেশের সমুদয় কল্প Cottage industry, কাপড় বোনা, হাঁড়ী গড়া ইত্যাদি। নূতন কোথায়? অতএব যদি নাম চাও, তাহা হইলে গ্রাম্যকলা বলা চলে। 'কলা' মানে কলনা করা, গড়া। বঙ্গদেশের গত লোক-সংখ্যান (Statistics) হইতে জানা যায়, শতকে ৭৮ জন কৃষিবার্তায়, ৭ জন কলায়, ৫ জন বাণিজ্যে, ৩ জন পণ্যবহনে, ৩ জন সেবায় এবং ৫ জন ভিক্ষা প্রভৃতি কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা করিতেছে। ইহা মনে রাখিয়া, কোথায় কি জ্ঞান জন্মাইলে উপকার হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া, কর্মের সহিত ধর্মের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য রাখিয়া, জনশিক্ষায় প্রবৃত্ত হও।

প্রমথ॥ এখন প্রদর্শক কোথায়?

গণেশ॥ এখন নাই, কিন্তু সুশীল, সুভাষী, ধার্মিক ও জ্ঞানী প্রদর্শক শিখাইয়া লইতে হইবে। তিনি সুদর্শন, অল্প স্বল্প গীতজ্ঞ হইবেন। বঙ্গদেশে প্রায় লক্ষ গ্রাম আছে। প্রতি ১০ খানা গ্রামে একটা হাট ধরিলে প্রদর্শকের ১০ হাজার 'স্থান' হইবে। বৎসরে চাতুর্মাস্য বাদ দিলে ৮ মাস থাকে। প্রত্যেক 'স্থানে' দুই দিন ধরিলে এক এক প্রদর্শক ৮০ স্থান বেড়াইতে পারিবে। অতএব এক বঙ্গ-দেশের তরে ১০০ প্রদর্শক আবশ্যক। পাঁচ জন পাইলে কাজ আরম্ভ করিতে পার। দুইজন কৃষি, একজন কলা, দুইজন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইবে। ভৃত্যসহ পাঁচজনের নিমিত্ত বছরে পাঁচ হাজার

টাকা ব্যয় ধরিতে পার। রেল-ভাড়া ষ্টীমার-ভাড়া প্রায় লাগিবে না। কারণ একেবারে বহুদূরে যাইতে হইবে না। প্রবাসব্যয়ও প্রায় পড়িবে না। যে গ্রামে হাট বসে, সে গ্রামে কিংবা নিকটবর্তী গ্রামে এমন উদ্‌যোগী সংকারশীল লোক পাইবে যাহার বাড়ীতে ভৃত্যসহ তিন দিন থাকিতে পারিবে। চেষ্টা সফল হইলে দেখিবে, গ্রামের লোকে প্রদর্শককে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছে। প্রথম প্রথম লোকে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কেন আসিয়াছ? অর্থাৎ তোমার কি স্বার্থ আছে? তোমার ব্যবহারে যদি উত্তর না পায়, তাহা হইলে তুমি অযোগ্য। হাত ধরিয়া তুলিবে, কিন্তু গলাধরা-ধরি করিবে না। চাতুর্মাস্যের দেড়মাস ছুটি, তোমাদের আড়াই মাস সাধনার সময় হইবে। সে সময় যথা-কর্তব্য নিরূপণ করিবে, দেশ-জ্ঞান সঞ্চয় করিবে, কথা রচনা করিবে, প্রদর্শনের দ্রব্য, ছায়াচিত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিবে। কলিকাতায় কিংবা অন্য স্থানে দেশ-হিতৈষী সৎকর্মশীল বিজ্ঞ ৫ জনের 'দেশ-পঞ্চক' থাকিবে। ইহাঁরা 'অবৈতনিক'। ইহাঁদিগের উপর সমস্ত নীতি নির্ভর করিবে। ইহাঁরা অর্থ-সংগ্রহ করিবেন, কর্মের ব্যবস্থা ও আয়োজন করিবেন, ইহাঁরা এক পয়সা দামের এক এক কৃষির, এক এক কলার, এক এক বার্তার, স্বাস্থ্যরক্ষার ছোট ছোট পুস্তিকা লেখাইয়া প্রকাশ করিবেন। এক পয়সা দামের সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিবেন। হাটে হাটে সাপ্তাহিক পত্র যাইবে; প্রদর্শক গ্রামে পুস্তিকা লইয়া যাইবে। পুস্তিকা কিংবা সাপ্তাহিক পত্রের সব দাম পাইবে না, বেচিয়া লাভও করিতে বসিবে না। এক একটা ছায়া-যন্ত্র কিনিতে ধর ১০০৲ টাকা, প্রতি কাচপট করিতে ৪৲। প্রত্যেক প্রদর্শকের নিকটে অন্ততঃ ৫০ খানা। অতএব পাঁচটা সংযোগ (set) করিতে অন্ততঃ ১৫০০৲ টাকা পড়িবে। একজন প্রদর্শক ফটোগ্রাফ তুলিতে ও কাচপট করিতে জানিবে। যেখানে উত্তম কিছু দেখিবে, তাহা উদাহরণ হইতে পারিবে। বছর বছর নূতন নূতন জ্ঞান জন্মিবে, নূতন নূতন আয়োজনও করিতে হইবে। বোধ হয় পঞ্চকের হাতে বৎসরে ৫০০০৲ টাকা থাকা আবশ্যক হইবে। বৎসরে ১০,০০০৲ টাকা কত দিকে উড়িয়া যাইতেছে। সংকল্প সফল হইলে কর্ম বাড়াইতে পারিবে। তখন দেখিবে আমরা বুড়ারাও তোমাদের কথা শুনিবার নিমিত্তে লালায়িত হইতেছি। ধর্ম ও সমাজের যোগ সাধন নিমিত্ত কথক বা প্রদর্শক নিযুক্ত করিতেই হইবে।

টীপ।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গের অবস্থা চিন্তা করিয়া 'শিক্ষাপ্রকল্পে'র প্রবন্ধদ্বয় লিখিত হইয়াছিল। এক্ষণে সে বঙ্গ নাই। পূর্বকালের বঙ্গের মাত্র তৃতীয়াংশ রহিয়াছে। এখন জনসংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি এবং গ্রামসংখ্যা ত্রিশ হাজার দাঁড়াইয়াছে। এখন রাজা বিদেশী শাসক নয়; আমাদের নিজেদের রাজা, নিজেদের মন্ত্রী দেশপাল করিতেছেন। এক্ষণে আমরা নির্ভয়ে 'স্বদেশী' গান গাহিতে পারি। 'জয় ভারতের জয়', 'জয় ধর্মের জয়' বলিয়া বেড়াইতে শঙ্কা নাই। এক্ষণে এইরূপ গীত শিক্ষানীতির অন্তর্গত করিতে হইবে।

কিন্তু অর্থব্যয় অধিক করিতে হইবে। এখন টাকার মূল্য একচতুর্থাংশ হইয়াছে, শিক্ষা বিস্তারের ব্যয় চতুর্গুণ বাড়িয়াছে। জনসংখ্যা একশত হইলে পাঠশালার উপযুক্ত বয়সের বালক বালিকা ১৫ জন ধরা যাইতে পারে। তদনুসারে পশ্চিমবঙ্গে ত্রিশলক্ষ বালক বালিকার জন্য পাঠশালা চাই। এইরূপে দেখিতেছি একলক্ষ পাঠশালা এবং অন্ততঃ দুইলক্ষ শিক্ষক চাই। দেশে জ্ঞান-প্রচারের নিমিত্ত সম্প্রতি পাঁচজন প্রদর্শক লইয়া কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। উপযুক্ত প্রদর্শকের বেতন অল্প হইবে না। এক ভৃত্যের বেতনও অল্প নয়। অতএব বোধহয় প্রত্যেকের নিমিত্ত বৎসরে ২৪০০৲ টাকা এবং পাঁচজনের নিমিত্ত ১২০০০৲ টাকা লাগিবে। পুস্তিকা লেখাইতে উপযুক্ত লেখক বাছিতে হইবে। ইদানীর গল্প-লেখকের কর্ম নয়। গল্পের ভাষা ও ভঙ্গি চলিবে না। ভাষায় মাধুর্য ও গাম্ভীর্য থাকিবে। গ্রামে গ্রামে প্রচারের নিমিত্ত সাপ্তাহিক পত্র চাই। নাম হইবে, 'সাপ্তাহিক সমাচার'। দাম এক পয়সা। প্রদর্শক ছায়া-চিত্র (Magic Lantern Slides) দেখাইবেন, 'সিনেমা' নয়। সিনেমায় আড়ম্বর যত, ফল তাহার শতাংশ। কারণ, দর্শকেরা সিনেমা দেখিতে আগ্রহ করিবে, বিষয় গ্রহণ করিতে ভুলিয়া যাইবে।

॥ ১৩৫০ ॥

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

॥ ১৩৫১ ॥

১৯. রায়তের কথা শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ